আশাপূর্ণা দেবী

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১০ই মাচ ১৯৬৭

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ মনমোহন বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

গাড়িখানা তা'হলে ছাড়ল।

শব্দ শুনে টের পেলাম। নিজের ঘরে বসেই পেলাম। দোতলার ঘরে বসে। চির-পরিচিত সেই পরপর দুটো শব্দ। দরজা বন্ধ করার 'দড়াম' শব্দ, আর স্টার্ট দেওয়ার গতির ব্যঞ্জনাময় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার শব্দ।...খুব ছেলেবেলা থেকেই গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলেই আমার এরকম মনে হয়, কী যেন হাতছাড়া হয়ে গেল, কী যেন হারিয়ে গেল।

আজ কিন্তু তা মনে হলো না, আজ যেন একটা হাঁফছাড়া ভাব এল। যদিও ওই 'দড়াম' শব্দটা আজ বেশি রূঢ় আর অমার্জিত মনে হলো।

আমি জানি ট্রেনের এখনো অনেক দেরি, স্টেশনে গিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে ওঁকে। যার থেকে বিরক্তিকর আর কিছু নেই। তবু তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছে যাবার জন্যে কী উৎসাহ। কী ব্যস্ততা।...'চক্ষুলজ্জা' নামের যে পাতলা চাদরখানা দিয়ে মহিলাটি এ-পর্যন্ত তাঁর আবরণটি টেনেবুনে ঢাকাঢুকি দিয়ে চলে আসছিলেন, মনে হচ্ছে—এবার সেটাকে ইচ্ছে করেই টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন। যেমন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় চা-খাওয়া খালি মাটির ভাড়টা রেলগাড়ির জানলা দিয়ে।

তবে?

তবে অন্যেরই বা কী দায় পড়েছে! এখনো আবার সেই ছেঁড়া চাদরখানা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের নির্লজ্জ আবরণটাকে টেনেবুনে ঢাকা দেবার চেষ্টায়...খুব সম্ভব মহিলা এ-বাড়ির দরজা থেকে চিরতরেই বিদায় নিয়ে গেলেন, অথবা অবহেলায় ছেড়ে দিয়ে গেলেন। তবু আমি একবার নীচে নেমে সেই গেট পর্যন্ত গিয়ে 'সী অফ্' করে আসিনি।

/আর ওই মিথ্যা আবরণটা দিয়ে ঢাকতে শরীর খারাপের ভানও দেখাইনি। আমাদের এই মজার সমাজে 'শরীরের' দোহাই দিয়ে সব ত্রুটিই মাপ করিয়ে নেওয়ানো যায় তো।

এ-বাড়ির মালিক একবার আমাকে নিয়ে সেই পরীক্ষাটি করতে চেষ্টা করেছিলেন।...আমার ঘরের বাইরে দরজার কাছ থেকে ডেকে বলেছিলেন, কী রে, তুই এখনো উঠিসনি? শরীর-টরীর খারাপ হলো না কি? বিকেল গড়িয়ে গেল।

আমার বুঝতে দেরি হয়নি, এই প্রশ্নটা হচ্ছে আমাকে একটা নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা, আমার ইচ্ছাকৃত অবহেলাসূচক আবরণটাকে আবরণ দেওয়ার প্রয়াস।

কিন্তু আমি এই চালাকির শিকার হতে যাব কেন? ওনার চেষ্টাকে একটি সুডৌল সুষ্ঠু রূপ দিতে মিছে করে বলতে যাব কেন, হ্যাঁ শরীরটা তেমন ইয়ে নেই—দুপুরে দারুণ ঘুমিয়ে পড়লাম।

না, আমি ওসবের ধার দিয়ে গেলাম না, আমি ঘরের দরজার কাছ পর্যন্ত বেরিয়ে এসে বলেছিলাম, 'শরীর খারাপ হতে যাবে কেন?'...খুব জোর দিয়ে বলেছিলাম।

যেন শরীর খারাপ হওয়াটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, যেন তেমন কখনো হয় না।

আমার ওই জোরালো 'কেন'র পরও বাড়ির মালিক জোড়াতালি দেওয়ার গলায় বলেছিলেন, ওর আর কেন কী? হলেই হলো খারাপ। এখনো পর্যন্ত শুয়ে রয়েছিস, তাই ভাবলাম—

জোড়াতালি দিতে চেষ্টা করলেন, তবু গলাটা বেশ খোলা শোনাল। মানে শোনালেন তাই ভদ্রলোক, যাতে বাড়ির সকলে শুনতে পায়। 'সকলে' মানে আর কি লোকজন চাকর-বাকর আর, অবশ্যই ওই মহিলাটি, যিনি তখনো গাড়িতে গিয়ে ওঠেননি, এই বাড়ির মধ্যেই ছিলেন। বোধহয় শেষবারের মতো তাঁর 'নিজস্ব' স্নানের ঘরটার বিলাসী আরামটুকু ভোগ করে নিচ্ছিলেন।

আমি আরো গলা তুলেছিলাম, বলেছিলাম, কে বলেছে শুয়ে

আছি ? মোটেই না। ইচ্ছে করে ঘর থেকে বেরোচ্ছি না। কেন বেরোব হ্যাংলার মতো ?

তার মানে একেবারে গাছের গোড়াটায় কোপ মেরে দিয়েছিলাম। যাতে আর কোনো ডালপালা না গজায়। যাতে মহিলাটি স্নানের ঘর থেকে সেজেগুজে বেরিয়ে, পাউডার আর সেণ্টের গন্ধ ছড়িয়ে এ-ঘবের দরজায় এসে একবার দাঁড়াতে না আসেন।

তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে-মনে রিহার্শাল দিয়ে চলেছিলাম যদি মহিলা ধৃষ্টতাব পরাকাষ্ঠা দেখাতে সে-দুশ্চেষ্টা করতে আসেন, তো কী-কী কড়া কথা শুনিয়ে দেব।···আবার এও ভাবছিলাম, কড়া কটু কোনো কথাই নয়, সোজা মুখের উপব দবজাটা বন্ধ করে দেব।··· কিন্তু ওই বিহার্শালটা কাজে লাগল না, আস্তে-আস্তে পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মেবে গেল। সব চুপচাপ নিস্তব্ধ।···বাক্স সুটকেস দুটোও নামিয়ে নিয়ে গেল ওবা নিঃশব্দে।

তবু মনে হলো নীচেব তলায় নাটকের শেষ অংশটা অভিনীত হচ্ছে!

যাক এতক্ষণে যবনিকা পড়ল। পরপর ওই দুটো শব্দ সেটা জানিয়ে দিয়ে গেল।···আমি জানি যদি আমি ওই 'হ্যাংলা' শব্দটা ব্যবহার না করতাম, তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যেত। হয়ত আমাব ওই ইচ্ছে কবে ঘব থেকে না বেবোনোটার অন্য অর্থ করা হতো, অন্য ব্যাখ্যা। আর অপবপক্ষ হয়ত বা তাতে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়তেন। আমি তখন তাই নতুন করে জোর দিয়ে হ্যাংলা শব্দটা উচ্চারণ কবেছিলাম।

তবে আর একজন অবশ্যই নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত ওই 'হ্যাংলা'র পার্ট প্লে করেছেন। তিনি হচ্ছেন এ-বাড়ির মালিক, কোনো একটা যেন নাতিবৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের চীফ এঞ্জিনীয়ার মিস্টার আর. এম. মুখার্জি। যিনি কিছু আগে আমার কাছেও প্রায় হ্যাংলার ভূমিকায় নেমেছিলেন।···

গাড়ি ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত যে মুখার্জি সাহেব তার ধারে-কাছে

ঘুরঘুর করেছেন, নড়েননি সেখান থেকে, এতে আমি নিশ্চিত। নিশ্চয় যথারীতিই তদ্‌ব্যস্ত হয়ে তদারক করে মরেছেন মালপত্রগুলো ঠিক-মতো উঠল কিনা, গাড়িতে অসুবিধে ঘটতে পারে, আয়োজনে এমন কোনো ভয়াবহ ঘাটতি ঘটে যাচ্ছে কিনা এবং সাবধান বাণীটি উচ্চারণ করতে একশবারের জায়গায় মাত্র নিরানব্বইবার উচ্চারণ করা হলো কিনা এইসব দেখতে।...আর এও জানি এত সবের পরেও গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল এইভাবে মোটা এক গোছা কাগজ-খণ্ড মহিলার কোলে ফেলে দিয়ে বলে উঠবেন, এটা রাখো, আরও দরকার-টরকার হলে জানিও।

হ্যাঁ শেষ-মুহূর্তে।

যাতে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ছাড়া প্রত্যাখান করবার আর কোনো রাস্তা না থাকে।

হ্যাঁ এই সবই করবেন, ওই মিস্টার মুখার্জি। অবধারিত এ আমার জানা। এই লোকটিকে আমি ওই মহিলাটির থেকেও বেশি ঘেন্না করি। আজ আরও করছি। একে একজন 'গুরুজন' ভাবা তো দূরের কথা ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে আমার, এটা ভাবতেও গা 'রি-রি' করে ওঠে।

ক্রমশঃ আমি নিজেকেও ঘেন্না করতে শুরু করছি, কারণ ওই সম্পর্কের বন্ধনটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মন থেকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেললেও, সমাজের সামনে তো এই পরিচয়টাকেই বহন করে চলতে হবে? এ-বাড়ির ছাদের তলায় মাথা রেখে থাকতে হবে, এদের রান্নাঘরের অন্নে পুষ্ট হতে হবে।

উপায় নেই। এছাড়া উপায় নেই।

এ-বাড়ির বিষাক্ত বাতাসে দমবন্ধ হয়ে এলেও, এই হাওয়াতেই নিঃশ্বাস নিতে হয় আমায়, নিতে হবে।...কারণ আমি একটা উনিশে পা-দেওয়া সদ্যযুবতী মেয়ে। কোনো একটা আশ্রয়ে থাকা ছাড়া আমার গতি নেই।...তাছাড়া সামনের বছরে আমায় এম. এ.

ফাইন্যাল দিতে হবে। হ্যাঁ দিতেই হবে। কারণ ওই এম. এ. ডিগ্রিটাকে অবলম্বন করেই তো আমার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা।

জানি না স্বপ্নটা নেহাৎই স্বপ্ন কিনা। সেটাই তো স্বাভাবিক। 'মিস পল্লবিনী মুখার্জি' শিক্ষিত বেকারের সংখ্যায় একটা নতুন সংযোজন হবে মাত্র।... তবু ওই স্বপ্নটাকেই অবলম্বন করে আপ্রাণ পড়ে চলেছি। বাড়ির পরিস্থিতি পড়ার অনুকূল নয় বলে সোমাদের বাড়ি গিয়ে পড়ি।

সোমা অবশ্য আমার সত্যিকার অবস্থা জানে না, ভাবতেও পারে না। ভাবে বড়লোকের মেয়ের এ-একটা উদ্ভট খেয়াল। নইলে এতবড়ো বাড়িটার একমাত্র অধিকারী আমি 'বাড়িতে সব সময় বাইরের লোক আসে' বলে, নিশ্চিন্তে পড়বার মতো একটু জায়গা পাই না? যারা আসে তারা তো মিস্টার মুখার্জির লোক। অথবা মিসেস মুখার্জির। তারা কি মিস মুখার্জির পড়ার ঘরে হানা দিতে আসে? তাছাড়া তার পড়ার ঘরটা ছাড়াও বাড়িতে কি আরো ঘর নেই? নেই অনেক জায়গা?...তিনতলায় মিস্টার মুখার্জির অনেক সাধের আর অনেক যত্নের—লাইব্রেরি রুমটায় কে গোলমাল করতে যায়? সারা তিনতলাটাই তো ওই লাইব্রেরি বাবদ উৎসর্গ করে রেখেছেন মিস্টার মুখার্জি। ছাদের আধখানা জুড়ে দেয়াল জোড়া র‍্যাক আর আলমারি সম্বলিত বিরাট হলঘর। এবং বাকি ছাদটা রেলিং দিয়ে ঘিরে খোলা বারান্দার রূপ দেওয়া আছে। এ-হেন ঐশ্বর্য যে-কোন সাহিত্যের স্টুডেন্টের পক্ষেই বিরাট লোভনীয়। বাংলা ইংরিজি যে-কোন সাহিত্যেরই হোক কারণ মিস্টার আর. এম. মুখার্জি নামের ভদ্রলোকটি কর্ম-জীবনে এঞ্জিনীয়ার হলেও, একদা তাঁর একটা মর্মজীবন ছিল। জীবনে আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর সেই মর্মজীবনের স্বপ্ন সফল করে তুলেছিলেন।... কিন্তু সারাদিনে একবারও কি সে-ঘরে তাঁর পা পড়ে?

নাঃ একেবারে পড়ে না তা বলব না, পড়ে, তবে সারাদিনে একবারও না, পা পড়ে গভীর রাত্রে। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনতলার

চাবিটি হাতে নিয়ে উঠে যান। মাঝে-মাঝে প্রায়ই আর নামেন না। শুনি সেখানেই সোফায় কি ডিভানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন পড়তে পড়তে।

সন্থ পলাতকা ওই মহিলাটি অবশ্য বলে থাকতেন, ঘুমিয়ে পড়াটাই শুধু নয়, বই পড়াটাও ছিল। অন্য পরিস্থিতির কবল থেকে হাত এড়াবার ফন্দী। হতেও বা পারে, ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। তুজনের কার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে, যে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে হবে?

মিস্টার মুখার্জির এই লাইব্রেরি রুমটা যে, শুধু অধ্যয়নেরই অনুকূল তা নয়, ঘরটা বাতানুকূলও। গ্রীষ্মের তুপুরে আমি যখন এই হিম ঘরটা ছেড়ে সোমার পড়ার ঘরের সেই গরুরগাড়ির চাকার মতো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ-করা ডানানড়া সীলিং ফ্যানটার নীচেয় বসে পড়াশুনো করি, তখন সোমার আক্ষেপোক্তি আর আমার বুদ্ধি সম্পর্কে হতাশার অভিব্যক্তি দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সোমা যদি এই ঘরটায় এসে পড়তে পেত, বর্তে যেত। আমি অনুভব করি সোমা একান্ত প্রত্যাশা করছে ওর এই হায়হায় বাণীতে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ প্রস্তাব করে ফেলি পালাটা বদলা-বদলি হোক না-হয়। সোমাই এ-বাড়িতে এসে হাজির হোক, একসঙ্গে পড়া যাবে।...মাঝে-মাঝে এমন আশঙ্কাও হয় সোমা বুঝি নিজেই হঠাৎ সে-প্রস্তাব করে বসে, তা এখনো পর্যন্ত সেটা হয়নি।

অতএব আমার পড়ার জায়গা সোমার ছোট পড়ার ঘরটা। সোমাদের বাড়িটা আমার এত ভাল লাগে কেন, এ-নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমি, আর করে-করে বুঝে ফেলেছি ভাল লাগে সোমার মা নেই বলে।...সোমা বড় হয়ে ওঠার অনেক আগে সোমার মা মারা গেছেন। স্মৃতিতে মা শুধু হাসপাতালে খাটে-শোওয়া একটা শীর্ণ ছায়া। সোমার এই সুখকে আমি হিংসে করি। সোমার বাবা আছেন অবশ্য, তাঁকে আমি কোনোদিন দেখিনি। তিনি নাকি তাঁর কর্মজীবনের ঋণশোধ করার বাইরের সময়টুকু-

টুকরো অংশ, সকাল আর সন্ধ্যা, পুজোর ঘরেই কাটান।...এইসব লোকদের নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

সোমা যে কেন পালা পালটানোর প্রস্তাব করতে পেরে ওঠে না, তার কারণও আমি অনুধাবন করে দেখেছি। পারে না ওদের অবস্থা আর আমাদের অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাতের জন্যে।

উঁচুতলারা খেয়াল হলে সহজেই নীচুতলার কাছে নেমে আসতে পারে। কারণ, সেই আসাটা—তার 'বিনয়' তার 'সরলতা' তার 'মহানুভবতা'।...কিন্তু নীচুতলারা ?...নাঃ তারা কিছুতেই সহজ হতে পারে না, অনায়াসে উঁচুতলার কাছে পৌঁছতে পারে না। কারণ, জানে সেটা দেখতে লাগবে হ্যাংলামির মতো। ও আমাদের এই লাইব্রেরি ঘরটায় এসে পড়তে পেলে বর্তে যাবে ঠিকই কিন্তু নিশ্চয় জানি, সহজ হতে পারবে না।

আমি যেমন স্বচ্ছন্দে ওর তেল-নুন-মাখা মুড়ির বাটিটায় ভাগ বসাতে পারি, ও কি কখনো কোনোদিন তেমন স্বচ্ছন্দে আমার রাজকীয় খাবার-ভরা প্লেটে ভাগ বসাতে পারবে ?

কিন্তু কাল থেকে কি আর ওদের বাড়ি পড়তে যাব ? গেলেই তো এ-বাড়ির মহিলাটি আবার এখন কোথায় গেলেন জিগ্যেস করে বসবে। বলবে বাক্স সুটকেস নিয়ে উনি একা গেলেন কেন ভাই ?...

কিন্তু এই একা যাওয়াটা কি ওঁর প্রথম ? কেউ তত টের পায় না তাই। বারবারই তো উনি এইভাবে চলে যান মিস্টার মুখার্জির সংসার থেকে। সেই যাত্রার মুহূর্তটিতে মনে হয় এই যাওয়াই বুঝি—শেষ-যাওয়া, এ-বাড়িতে আর ফিরে আসবেন না। উনি তবু আবার এসেছেন ফিরে। তার কারণ—এ-যাবৎকাল ওই পাতলা চাদরের আবরণটাকে টেনে-বুনে কিছুটা ঢেকে-ঢুকে চালিয়ে এসেছেন।...লোকজন জেনেছে উনি ওঁর অসুস্থ বাপকে দেখতে যাচ্ছেন, কাজেই সে অবস্থার উন্নতি হলে চলে আসবেন।

যখন তখনই 'যায় যায়' হয়ে পড়েন এমন একটি বাবা ওঁর ভাঁড়ারে মজুত আছেন। এটা কম সুবিধের কথা নয়।...বিপত্নীক বাপ,

আর অবিবাহিত এক দাদা এই ওঁর বাপের বাড়ি। কাজেই বাড়ির একমাত্র কন্যা হিসেবে আইনত ওনার ডিউটি বেশি।

সেই ডিউটি পালন করতে ওঁকে হঠাৎ-হঠাৎ জলপাইগুড়ি ছুটতে হয়। এই ছিল ওঁর এতোদিনের আবরিত মূর্তি।...সে-মূর্তিতে উজ্জ্বল রং দিতে প্রথম-প্রথম মিস্টার মুখার্জি ওঁকে ঘাড়ে করে জলপাইগুড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতেন। তখন একা নয়। তখন সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে থাকত।...

অতঃপর ছবিতে সেই জমাটি রঙে তুলিটা আর তেমনভাবে বুলিয়ে চলা সম্ভব হলো না। তবু যতটা সম্ভব টেনেও চলা হয়েছে। মিস্টার মুখার্জি অন্তত স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন, এবং হ্যাংলার মতো বহুবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত। অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে চলেছেন যাত্রাকালে এবং মাঝে-মাঝে মোটা মনিঅর্ডারের মারফতে

তারপর কেমন করে কী হয়েছে জানি না, দৃশ্যমান ঘটনা এই। আবার কোন একদিন ফিরে এসেছেন উনি এ-বাড়িতে। যখন এসে ঢুকেছেন ভারি থমথমে মুখ দেখে হঠাৎ ভয় হয়েছে উনি বুঝি এবার ওঁর ভাঁড়ারে মজুত বাবাটিকে হারিয়ে এসেছেন। কিন্তু জানা গিয়েছে তা নয়। এবং ক্রমশ আস্তে-আস্তে উনি আপন স্বভাবে ফিরে এসেছেন।...ওঁর অনুপস্থিতিতে সংসারের যে হাল হয়েছে, তাই নিয়ে আবার বকাবকি শুরু করেছেন, বাড়ি সুদ্ধ সকলের 'অপদার্থতা' সম্পর্কে তীব্র রায় দিয়েছেন আর গভীর রাত্রে পাশের ঘরে একটা বালিকার উপস্থিতি বিস্মরণ হয়ে মিস্টার মুখার্জি নামের ওই লোকটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন অনর্গল কটূক্তি। অকথ্য অদ্ভুত সেই অভিযোগগুলো যে একটা ভীরু অসহায় ছোট মেয়ের অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে ওঠা চেতনার উপর কী দমাদম হাতুড়ি বসিয়েছে, কী ধারালো ছুরি বিঁধিয়েছে, কী তীক্ষ্ণ করাত চালিয়েছে, তা খেয়ালও করেননি কোনদিন।

ছোট সেই মেয়েটার অপরিস্ফুট বোধের জগতে ওইসব কথা আর কথার আভাস যেন কি একটা ভয়াবহতার ইশারা নিয়ে আসত। যেন অজানা একটা ক্লেদাক্ত রহস্যের ঘরের জানলাটা উৎকট ঝড়ের দাপটে হঠাৎ-হঠাৎ খুলে-খুলে পড়ছে। সেখানে জমাট কালো অন্ধকারের স্তূপের মধ্যে মাঝে-মাঝে এক-একটা আগুনের ফুলকি। যেন রাতের অন্ধকারে ওই মাঠের ধারে ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে বসে-থাকা কালো পেঁচার চোখ।...ইতর, ছোটলোক, নোংরা, অসভ্য এ-সব কথার তো মানে জানে মেয়েটা, কিন্তু চরিত্রহীন মানে কী? কী মানে শয়তান, হিপক্রিট্, জোচ্চোর শব্দগুলোর?

ওর ঘুম হতো না, ভয়ানক তেষ্টা পেত, আর ভীষণ কান্না পেত। পর্দা-ফেলা ওই দরজাটার ওপারে কী ঘটনা ঘটছে, জানবার জন্যে রুদ্ধশ্বাস কল্পনার আলো-আঁধারিতে ঘেমে যেত।...কোন কোন রাত্রে কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে ফেলার ঝনঝন শব্দ ওঁকে যেন মেরে ফেলত ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা হতো।...কিন্তু অনেকদিন আগে একদিন সে ইচ্ছে পুরণের ফল পেয়েছিল। তারপর থেকে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মুখে হাত চাপা ওই ইচ্ছেটাকে দমন করেছে।...

সেদিন—ওই ডুকরে কেঁদে ওঠার পর মাঝখানের দরজাটা খুলে গিয়েছিল, গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা সেমিজ (তখন জামাটাকে তাই মনে হয়েছিল মেয়েটার) পরে বেরিয়ে এসেছিল একটা উগ্রচণ্ডী মূর্তি। তীব্র প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল মেয়েটার উপর, কী হয়েছে কী?

মেয়েটা ওই মূর্তিটাকে দেখে হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছিল। ও-ই মূর্তিটাকে কি ও চেনে?

ও-ঘর থেকে মিস্টার মুখার্জির ঈষৎ ব্যাকুল গলা শোনা গিয়েছিল কছু কামড়ায়-টামড়ায়নি তো?

কী কামড়াবে?

ছুরির ফলার মতো একটা ধারাল প্রশ্ন এই ব্যাকুলতাকে চিরে ফেলেছিল, কী কামড়াবে? সাপ?

না মানে যদি বিছে-টিছে—

ওঃ বিছে! কাঁকড়া বিছে বোধহয় মাঝরাত্তিরে তোমায় যেমন কামড়ায় তেমনি তোমার মেয়েকেও কামড়েছে? এই বল্‌ চেঁচালি কেন? বল্‌। বলতেই হবে—

মেয়েটা তখন ভীরু ছিল, বোকা ছিল, কারণ ছোট ছিল। তাই কেঁদে ফেলে বলে উঠেছিল, তোমরা কি করছ? তোমরা—কেন চেঁচাচ্ছ?

আমরা কী করছি? অসহ্য! অ্যাঁ তোমার কী, খবরদার যেন আর কোনোদিন—

মেয়েটা তখন মরীয়া হলো, তোমরা কাঁচের গেলাস ভাঙছ কেন?

বটে? আমরা কী করছি-না-করছি তোমায় তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে, বেশ করেছি ভেঙেছি। আরো ভাঙব! ফ্লাওয়ারভাস্‌ আয়না ছবি সব ভাঙব। কী করবি? কী করতে পারবি তুই আর তোর বাপ?

এরপর আর কী করতে পারে মেয়েটা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদা ছাড়া?

ঠিক আছে—

মহিলাটি আবার সেমিজ লট্‌পটিয়ে ও-ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে বলে যান, এই বলে রাখলাম আর কোনোদিন যদি এ-রকম অসভ্যতা দেখি আয়ার ঘরে শোবার ব্যবস্থা করব তোমার।

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বেগুনীরঙা মখমলের ভারি পর্দাটা দুলে উঠে বন্ধ দরজাটাকে আড়াল করে দিয়েছিল।...তবু আরো কথা শুনতে পেয়েছিল মেয়েটা বুদ্ধির অবতার! মেয়েকে আয়ার সঙ্গে শুতে পাঠান চলবে না। মেয়ের শিক্ষা খারাপ হয়ে যাবে। তাই মেয়েকে কোলে নিয়ে শুতে

হবে। যতসব গাঁইয়ামি।...কাল থেকেই মালতীর ঘরে শুতে পাঠাব ওকে।

তা হয়েছিল পাঠান।

কিন্তু মেয়েটার দুর্ভাগ্য সেখান থেকেও হাউমাউ করে কেঁদে দমাদম দরজা ঠেলতে হয়েছিল ওকে।...হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে 'জল খাব' বলতে গিয়ে দেখেছিল ওপাশের চৌকি খালি, মালতী নেই। আর ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে গিয়ে দেখেছিল দরজার বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগান।

সেই ঘরটা দোতলার মধ্যেই, সিঁড়ির পাশে। সিঁড়ির দরজার কোলাপসিবল গেটে ভারি একখানা তালা লাগান থাকে।

মুখার্জি সাহেব ভুরু কুঁচকে ছিলেন। তাহলে মানুষটা গেল কোথায়?...মেমসাহেব ঠোঁট উলটে ছিলেন, যাবে কোথায়? বাথ-রুমে-টাথরুমে ছাড়া?

কিন্তু সে নিশ্চিন্ততার সুখকে বেশিক্ষণ ভোগ করা গেল না, সেই নিশ্চিন্ত জায়গাটাতেও সন্ধান মিলল না মালতীর।...সাহেব নীচের তলায় নেমে চাকরদের জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন, থমকে গেলেন, তালাটা কাৎ হয়ে ঝুলছে, চাবি খোলা।

মেমসাহেব ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন, থাক, হয়েছে। চাকর-বাকরকে ডাকাডাকি করে আর কেলেঙ্কারী বাড়াতে হবে না।

বাঃ! বেশ তো!...সাহেব বললেন, এইসব বিশ্রী ব্যাপারকে প্রশ্রয় দিতে হবে?

মেমসাহেব নাক কুঁচকে বললেন, প্রশ্রয় দিতে হবে না, ইগ্‌নোর করতে হবে।

ইগ্‌নোর করতে হবে!

হবেই তো। তোমার বাড়িতে কুকুর বেড়াল থাকে না, তাদের আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাও?

তারপর মেয়েটার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বলেছিলেন, চল। এখানে আর বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?…

কৃতার্থমন্য মেয়েটা তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়েছিল তার নিজের ঘরের দিকে। হ্যাঁ নিজস্ব একটা ঘরের মালিক সে অতি শৈশব থেকেই। এই ঘরের মালিক হওয়ার আগের স্মৃতিটা যেন পূর্বজন্মের স্মৃতির মতো আবছা ছায়া-ছায়া। মখমলের পর্দা ঝোলান ওই দরজাটার ওপিঠের সঙ্গে কি সেই স্মৃতি জড়িত?

মনে পড়ে না।

তবু কত কত দিন পর্যন্ত ওই দরজাটার দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থেকেছে মেয়েটা আর স্বপ্ন দেখেছে সেই পূর্বজন্মের স্মৃতিটার সঙ্গে এ-জন্মটা মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

উঃ কী হ্যাংলাই ছিল তখন মেয়েটা। ছিঃ ছিঃ।

ভাবলে এখন মাথা কাটা যায়, নিজের গালে নিজে চড় মারতে ইচ্ছে করে।…কিন্তু সেদিন সে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। মহিলাটির পিছু-পিছু নিজের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অথচ মনের মধ্যে উদ্বেলিত একটা বাসনা ঘরে ঢুকে পড়াকে স্থগিত রাখতে চাইছিল।

তখন মেমসাহেব চাপা গলায় বলেছিলেন, আজকের এই নিয়ে কারুর কাছে কোন কথা বলবে না বুঝেছ? তোমার ও-ঘরে গিয়ে শোওয়া, মালতীর হারিয়ে যাওয়া, কিছু বলবে না। মনে থাকবে?

মেয়েটা ঘাড় কাৎ করেছিল।

যাও আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? শুয়ে পড়গে।

সাহেব বলেছিলেন, খুব ইতস্তত করেই বলে ফেলেছিলেন, ভয়টয় পেয়েছিল, একা শুতে ইচ্ছে করছে না বোধহয়।

ওঃ! অন্যের ইচ্ছে-অনিচ্ছে সম্পর্কে জ্ঞানটা তো খুব টনটনে দেখছি। বেশ তো শুক ও এ-ঘরে। আমি বরং মালতীর ঘরটায় শুতে যাচ্ছি।

মালতীর ঘরে। উনি।

মেয়েটা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। বলতে পারেনি, আমি থাকলে তোমায় চলে যেতে হবে কেন ?

এখন ভাবলে হাসি পায় সেদিন ওই ছোট মেয়েটার চোখে সাহেব একেবারে দয়ার অবতার মমতার প্রতিমূর্তি দেবতাতুল্য বনে গিয়েছিলেন।···উনি কী ভাল কী ভাল !···ওঁর কতো মায়া !! কতো দয়া !

কথাটা ভেবেছিল সেদিন মেয়েটা, পরেও আরো অনেক সময় ভেবেছে কত মায়া।···

ওঁর মধ্যে কত ভালবাসা।

এখন সেকথা ভাবলে হাসি পায়, ঘেন্না করে।

হ্যাঁ মিসেসের বশীভূত ওই অপদার্থ লোকটির প্রতি এখন আমার অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কোন ভাব নেই ওঁকে একটু অপমান করে নিতে পারলেই আমার উল্লাস। সে সুযোগ পেলে একবারের জন্যেও ছাড়ি না।·· সে সুযোগ সৃষ্টি করবার তালে থাকি।

নিপীড়িত নির্যাতিত সেই বোকা মেয়েটার হয়ে আমি এখন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করি। কিন্তু কেন ? সেই মেয়েটাকে কি সত্যিই এখন আর 'আমি' বলে ভাবতে পারি ? আমি অমন বোকা ছিলাম ? অমন হ্যাংলা ছিলাম ?···

ছিলাম। ভাবতে ঘেন্না করলেও অস্বীকার করবার তো উপায় নেই, স্মৃতি-শক্তিটা যে আমার বড় নির্দয়, কিছুতেই কিছু ভুলিয়ে দেয় না।

হ্যাংলা ছিলাম, তাই অনেকদিন আগে যখন ওই মহিলা ওঁর বাপের 'যায় যায়' অবস্থার টেলিগ্রাম পেয়ে জলপাইগুড়ি নামের সেই জায়গাটায় ছুটে যেতেন (আচ্ছা টেলিগ্রামগুলো কে পাঠাত?) তখন আমায় ওঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন বলে কৃত-কৃতার্থ হয়ে যেতাম।

যদিও যাবার আগে দারুণভাবে শাসিয়ে রাখতেন, তিনি যা

বলবেন শুনতে হবে, অবাধ্যতা করলে কেটে দুখানা করে ফেলবেন। আমি যেন তাঁর আঁচল ধরে-ধরে না ঘুরি, নিজের মনে খেলে বেড়াই। দাদুর কাছে বসে থাকি, এই সব। আত্মসম্মান বোধহীন সেই ফ্রক-পরা 'আমিটা' সব বণ্ডেই সই বসিয়েছি।

কিন্তু সেই মুক্তি ভিক্ষার সুখটুকুই বা ক'দিন ভোগ করতে পেয়েছিলাম? যখান ওনার খেয়াল হয়েছে মেয়েটার জ্ঞানচক্ষু খুলে যাচ্ছে তখান মনে হয়েছে ওঁর স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটছে, নিরঙ্কুশ জীবনের স্বাদে অস্বাস্তর খাদ মিশছে। ব্যস, ফুরিয়ে গেল মেয়েটার সুখের দিন। তখন মেয়ের পড়ার ক্ষতি সম্পর্কে জোর চেতনা দেখা দিল তাঁর।

অথচ মেয়েটার কী ভালই লাগত সেই বেলগাড়ি চড়ে মামার বাড়ি যাওয়ায়। যদিও মামার বাড়ি বলতে যে একটা জমজমাটি ভাব মনে আসবার কথা, তেমন চেহারা ছিল না পলির মামার বাড়ির। শুধু অনেকখানি হেলা-ফেলা জায়গা-জমি জুড়ে মস্ত একখানা মফস্বাল বাড়ি, অনেক গাছ-পালা-ভরা একটা ফলের বাগান অনেকগুলো কাজ করবার লোকজন, আর শুধুমাত্র দাদু আর বিক্রম মামা।

হ্যাঁ। মামাকে শুধু মামা বলতে কেউ শেখায়নি আমায়, বিক্রমমামা বলতেই শেখানো হয়েছিল। মুখার্জি সাহেব। তখন যাঁকে আমি মায়ার অবতার বলে জানতাম, দেবতাজ্ঞানে ভালবাসতাম এবং বাপী বলে ডেকে বিগলিত হতাম, তিনি এক-একবার যখন আমাদের পৌঁছে দিতে যেতেন, তিনিও বলতেন বিক্রমবাবু।

ওই বিক্রমবাবু ডাকটা শুনলেই ঘোরতর আপত্তি জানাতেন মিসেস মুখার্জি। লীলায়িত ভঙ্গিমায় ঘাড় দুলিয়ে চোখ পাকিয়ে বলতেন, তুমি কিন্তু ভীষণ বেআইনী করছ। বাবু বলতে যাবে কেন আঁ, 'বিক্রমদা' বলবে। ও আমার থেকে চার-চার বছরের বড় না?

আশ্চর্য, কী অদ্ভুত তফাত ছিল কলকাতার বাড়ির মা আর

জলপাইগুড়ির মায়ের সঙ্গে। বলতে ধিক্কার আসে তবু স্বীকার করতেই হয় তখন ওই মহিলাটিকে আমি মা বলে ডাকতাম, মা বলে ভেবে আনন্দে চড়বড় হতাম। কিন্তু সে-ভাবটা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি পুরনো জামা-জুতো-ভ্যানিটিব্যাগের মতো।

মিসেস মুখার্জি? এই পরিচয়টা যখন এখন পর্যন্ত আঁকড়ে আছেন উনি, তখন সেটাই চালু রাখা ঠিক। আচ্ছা কী যেন বলছিলাম? ওঃ। কলকাতার মিসেস মুখার্জি আর জলপাইগুড়ির মিসেস মুখার্জির মধ্যে পার্থক্য।

পার্থক্য অবিশ্বাস্য রকমের।

একই চেহারার মধ্যে যেন সম্পূর্ণ দুটো সত্তা।

তুলনাটা এই রকম দেওয়া যেতে পরে—দুজনের একজন যেন বিদ্বেষ বিরক্তি অসন্তোষ অসহিষ্ণুতা আর ঔদ্ধত্যের বারুদে ঠাসা একটি বিষাক্ত বোমা, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে; অপরজন—লীলায় চাপল্যে কৌতুকে হাস্যে রহস্যে আহ্লাদিনী শক্তির একটি উজ্জ্বল প্রতীক, যে-কোনো পরিস্থিতিকে মাতিয়ে রাখতে পারে।

একই চেহারার মধ্যে দুটো সত্তা।

...কিন্তু চেহারাটা কি সম্পূর্ণ একই? তাতো নয়। চেহারাও তো পালটে যেত। প্রকৃতির ছাপ আকৃতিতে পড়তে বাধ্য। মুখের রেখাই তো মুখ। ক্রুদ্ধ বিরক্ত অভিযোগস্ফুরিত মুখের রেখা, আর আহ্লাদ উল্লাস আর বাসনা চরিতার্থতার সুখে উচ্ছ্বসিত মুখের রেখা তো এক নয়।

চেহারা যে পালটে যেত মিসেস মুখার্জির, সেটা তাঁর বস্তা-বস্তা ফটোর ক্রম বিবর্তন, অথবা তার তারতম্যের অন্তরালবর্তী ইতিহাসই সাক্ষী। কলকাতার এই বাড়িতে কিম্বা বাড়ির বাইরে যে-কোনো জায়গায় (বা ঠিকমতো বলতে গেলে জলপাইগুড়ি নামক সেই—স্বর্গ-ভূমিটি ব্যতীত) তোলা ফটো আর সেই স্বর্গভূমিতে তোলা ফটোগুলিকে নিরীক্ষণ করে দেখলেই বোঝা যায় কোথায় সেই পালটানর স্বাক্ষর।

ওই সুন্দরী মহিলাটির প্রখর সৌন্দর্যের ছাপ অবশ্যই তাঁর প্রতিকৃতিতে পড়তে বাধ্য, কিন্তু জলপাইগুড়িতে তোলা ছবিসমূহের মধ্যে অন্য একটা আলো, অন্য একটা জ্যোতি, অন্য এক রং। যেন মুখের চামড়ার নিচে থেকে ফেটে বেরিয়ে আসা আলাদা একটা প্রাণ-প্রাচুর্য। যেটাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না, অথচ প্রবলভাবে উপস্থিত।

আগে—যখন ওই ফটো আলবামগুলো উলটে-উলটে দেখত সেই ফ্রক-পরা পলি, তখন অবশ্য এমনভাবে ভাবতে জানত না সে। এমন বিশ্লেষণী শক্তিই বা কোথায় তখন তার?

সে শুধু দেখত আর ওই তারতম্য দেখে অবাক হতো। অবাক বলেই বারবার দেখত আর ক্রমশই যেন তার অনুভূতির গভীর স্তর থেকে চেতনার এক-একটা ঝলক উঠে আসত।

তখন থেকেই তার মধ্যে জন্ম নিতে শুরু করেছিল একটা রাগী গোঁয়ার বিদ্রোহী সত্তা। যা তার শাড়ি ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই স্পষ্ট চেহারা নিল। অবশ্য শাড়ি ধরাটাও তার ওই জেদী গোঁয়ার সত্তাটারই কারসাজি। যাঁকে তখনও পলি 'মা' বলে ডেকে কথা কইত, তাঁর তো তখন মেয়ের শাড়ি ধরায় ছিল দারুণ আপত্তি। শাড়ি? ছি ছি। কেন জগতে আর পোশাক নেই? সালোয়ার পাঞ্জাবি? স্কার্ট ব্লাউজ? ম্যাকসি? বার্মিস লুঙি আর জ্যাকেট কোট?

'থাকতে পারে, আরো অনেক রকম আছে—' মনে আছে সেই প্রথম দুঃসাহস, মুখের উপর বাদ-প্রতিবাদ করার।

অনেক রকম আছে কিন্তু নিজেদের দেশটারই বা নয় কেন?

নিজেদের দেশের? সেটা আবার কী?

ভুরু কুঁচকে ওঠে মেমসাহেবের, ওই পোশাকগুলো ভারতীয় নয়?

ভারতীয় হতে পারে, বাংলার তো আর নয়।

ও হো হো—

মেমসাহেব হেসে গড়িয়ে পড়েছেন, দেশাত্মবোধ। স্বাদেশীকতা। তা দেশটাকে এতো ছোট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলতে বুঝি বিরাট দেশপ্রেম আমি তো মনে করি এই সমগ্র ভারতবর্ষটাই আমার দেশ।

আমি বলতে পারতাম তা হলে তুমিই পরো ওইসব। মুখে এসে গিয়েছিল কিন্তু বলে উঠিনি। তখন তো সবে প্রথম দুঃসাহস।

সত্যি বলতে মেমসাহেবকে রাগাবার জন্যেই আমার শাড়ির বায়না। কিন্তু পরার পর হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম, শাড়ি পরলে শুধু সৌন্দর্যই বাড়ে না, কোথায় যেন একটা শক্তিও বাড়ে। রীতিমতো আত্মস্থ-আত্মস্থ লাগে। মেমসাহেবের মুখের ওপর কথা বলার সাহস এসে যায় অনায়াসে, অবলীলায়।

এটা আমার একটা নিজস্ব আবিষ্কার।

সোমা শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, মার মুখের ওপর চোটপাট করতে পারলে তোর আহ্লাদ হয়? কি জানি বাবা। আমার তো মনে হয়, মা যদি থাকতেন পুজো করতাম।

আমি মনে-মনে বলেছি হতেও পারে। তোমার ভাগ্যে হয়তো মা তেমনি দেবীর মতোই হতেন। যেমন তোমার বাবা যদিও ভদ্রলোকের নিঃসাড় উপস্থিতি। আর দিনের সমস্ত পার্টটাইমটা পুজোর ঘরে কাটানো দেখে আমার হাসিই আসে।

আসলে শ্রদ্ধা নম্রতা নিষ্ঠা বিশ্বাস—হৃদয়বৃত্তির এইসব বৃত্তিগুলিকে আমার খুব জোলো আর খেলো বলে মনে হয়। ও যেন চটচটে সেন্টিমেন্টেরই অপর পিঠ।

শখ করে শাড়ি পরাটা আমার স্থায়ী অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল ওই নতুন আবিষ্কার, আর—মেমসাহেব ক্ষেপে যাওয়ায়। উঃ কী মজাই লেগেছিল একদিন মুখার্জি সাহেবের এক বন্ধুর একটি মন্তব্যে মেম-সাহেবের ক্ষ্যাপামির বহর দেখে।

ভদ্রলোকের উক্তির মর্মার্থ ছিল শাড়িপরা আমাকে দেখে না-কি তাঁর মেমসাহেবের নবযৌবনা নবোঢ়া মূর্তিটি মনে পড়ে যাচ্ছে।

আর যায় কোথা, তিনি বলেছিলেন, পলি অবিকল আপনার মতো দেখতে হয়ে উঠেছে। হঠাৎ শাড়িপরা দেখে 'আপনি' ভেবে চমকে গিয়েছিলাম।

মেয়ে মায়ের মতো দেখতে হবে এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার তাতে এত ক্ষেপে যাবার কী হলো কে জানে। মেমসাহেব উত্তেজিত প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন, মোটেই না। পলি সম্পূর্ণ ওর বাবার মতো দেখতে।

বাবার মতো দেখতে।

মুখার্জি সাহেবের সেই বন্ধুটি বোধহয় ওই উত্তেজিত মুখটি সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল না হয়েই আবার নিজের কথা সমর্থন করলেন। মোটেই ও মুখার্জির মতো দেখতে না। অবিকল আপনার মতো।

আপনার একটা অদ্ভুত ধারণা—

বলে প্রসঙ্গে ছেদ টেনেছিলেন মেমসাহেব, আর তারপর তিনি চলে গেলে আমার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আমি জানতে চাই তুমি এইসব পাকামি ছাড়বে কি না?

ওনার রাগের সময় একটা যে নিদারুণ ভয় পেতাম, বোধকরি তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই পরে রাগ দেখলে ভারি মজা পেতাম আর খুব শীতল ভাব দেখাতাম।

আমি যখন অবাকের ভাবে প্রশ্ন করলাম, কী পাকামি? তখন নিজের কণ্ঠস্বরের শীতলতায় নিজেকে বেশ মান্য করতে ইচ্ছে হলো আমার।

মেমসাহেব আরো ক্ষেপলেন।

বললেন, কাল থেকে শাড়িপরা বন্ধ করতে হবে তোমায়।

কেন?

আরো ঠাণ্ডা হলাম আমি।

উনি হঠাৎ নিজের ঘুঁটি কাঁচিয়ে ফেললেন, বলে উঠলেন, আমার হুকুম!

আমি হেসে উঠলাম।

ভীষণ মজার কথা—মানে বাবার মুখে বোকার মতো কথা শুনলে উনি, মানে মেমসাহেব যেমন করে হেসে ওঠেন, তেমনি করে।

তার মানে শুধু আকৃতিতেই নয়, আস্তে-আস্তে প্রকৃতিতেও আমি ওনার মতোই হয়ে যাচ্ছিলাম, সেটা এখন বুঝতে পারছি।

তবে সেদিন নিজের হাসির শব্দে নিজেই চমকে উঠছিলাম।··· মুখার্জি সাহেব হঠাৎ যখন ওঁর ছেলেবেলাকার কোন স্মৃতি রোমন্থন করে বসেন, অথবা ফট করে বলে ফেলেন, আমার মা একটা মাত্র বাসনমাজা ঝি সম্বল করে কী সুশৃঙ্খলেই সংসার চালাতেন—

তখন মেমসাহেব এইভাবে হেসে ওঠেন।

কিন্তু এই সামান্য কথাটায় এত ক্ষেপে ওঠবারই বা কী ছিল? কেন? কেন, কেন? তবে কি কোথাও কোন রহস্য আছে? আমার জন্মের মূলে?···আমি কি এই মুখার্জি পরিবারের কেউ নই? আর. এম. মুখার্জির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই? আর সেটা নেই বলে সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা।

সেইটে সেদিন হঠাৎ এই কুটিল সন্দেহটা আমাকে সাপের মতো ছোবল দিয়ে বসল, তাব থেকে আর আমার মুক্তি হচ্ছে না। আমার ভিতরে যেন কতকগুলো আগুনেব শিখা জন্ম নিয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে।···ঝলসে উঠছে।···

এলোমেলো ছড়ান অনেকখানি জায়গা-জমি জুড়ে একটা মফস্বলি ধাঁচের বাড়ির ঘর বারান্দা দালান প্যাসেজ ' উঠোন বাগান।

ঝলসে উঠছে একটা হাসির আলো ঠিকরান উজ্জ্বল সুন্দর মুখ যেটা চেনা-অচেনার আলোছায়ায় দুর্বোধ্য। হ্যাঁ ওই মুখটা দুর্বোধ্যই। সুবোধ্য হচ্ছে সদা-বিরক্ত সদা-অসন্তুষ্ট অভিযোগে প্রখর সৌন্দর্যহীন সুন্দর মুখ। এই মুখটাকে হেঁট করে দিতে পারলেই যেন আমার বিজয় উল্লাস, হেঁট করার চেষ্টাই যেন জীবনের লক্ষ্য।

কেন মিস্টার মুখার্জির সেই বন্ধুটা আমার মধ্যে মিসেস মুখার্জির ছাপ দেখতে পেল।

আচ্ছা আমি তো ওই মহিলাটিকে ঘেন্না করি। খুবই ঘেন্না করি,

তবে ওর মতো হয়ে যাচ্ছি কেন? জানি না কী জন্যে কী ঘটে, শুধু দেখতে পাই ওঁকে 'ডাউন' করতে পারলে অদ্ভুত একটা আমোদ।

মহিলাটি যখন বললেন, শাড়ি পরবে না আমার হুকুম, আমি হেসে উঠলাম। একটা বাচ্চা ছেলে যদি হঠাৎ খুব বিজ্ঞের মতো পাকাটে কথা বলে বসে তাহলে বড়রা যেমন মজা পেয়ে হেসে ওঠে প্রায় সেইরকমই হেসে উঠলাম আমি।

তখন একটা ক্রুদ্ধ গর্জন যেন ঘরের বাতাসকে চাবুক মারল, হাসলে মানে?

আমি খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম, হাসলাম মানে হাসলাম।

মেমসাহেব ঠোঁটটা কামড়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন ঘর থেকে। কী মজা! কী মজা! বিজয় গৌরবের উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো আমার।

এরপর আমি দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ পাড়ার একটা স্টুডিও থেকে নিজের শাড়িপরা ফুল সাইজ একখানা ফটো তুলিয়ে এনেছিলাম। যেমন ভঙ্গির অনেক ফটো আছে মিসেস মুখার্জির। আমি দেখতে চাই। মিলিয়ে দেখতে চাই, মুখার্জি সাহেবের সেই বন্ধুর কথা সত্যি কি না।

ছবিটা নিয়ে অ্যালবামের পাতা খুলে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হলো—মুখার্জি সাহেবের বন্ধুই হারছেন।

কিন্তু তাতে কি শান্ত হলাম? সাপের বিষ একবার মাথায় চড়লে কি আর নামে?

কিন্তু জলপাইগুড়িতে তোলা সব ছবিই কি মিসেস মুখার্জির এই টেবিলে-ড্রয়ারে এখানে-সেখানে পড়ে থাকা অ্যালবামগুলোর মধ্যে আঁটা আছে?

নাঃ অনেক ছবিই তাদের মধ্যে অনুপস্থিত।···সেই ছোট্ট মেয়েটা তো জানে, দেখেছে তো, সেখানে কত রাশি-রাশি ছবি তোলা হয়েছে সেই লীলাময়ীর। মেয়েটার 'অবোধত্বে'র নিশ্চিন্ততায় কত বিচিত্র

'পোজ'-এর। মাঝে-মাঝে মেয়েটাকে ভাগিয়ে দিয়েও ক্যামেরা ক্লিক কবা হতো।

যেমন—'এই পলি, পলি, গ্যাখ গ্যাখ ওই প্রজাপতিটা কী চমৎকার, ধরতে পারিস ?'

'খুব-পারি' বলে বোকা মেয়েটা যখন পারবাব বাহাদুরিতে সাবা বাগানে ছুটোছুটি কবে মরত তখন তোলা হয়ে যেত কিছু-কিছু ছবি।

তুলত কে ?

তুলত বিক্রম রায়ের সেই ঝাঁকড়া-চুলো বন্ধুটা। যাকে দেখলে পলিব বেজায বাগ আসত, অথচ সে আসত পলিব সঙ্গে ভাব জমাতে।...পলিব বিরূপ মনকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় অনেক ঘুষ দিত সে—টফি, চকোলেট, খেলনা, বঙিন পেনসিল। কিন্তু পলির তাতে আবো বিরক্তি।

মাঝে-মাঝে অবশ্য বিক্রম মামাও ক্যামেরাটা টেনে নিয়ে বাগিয়ে ধরে তুলত ছবি।...পলি, মাব সঙ্গে দাঁড়া, পলি, ওই গাছ তলাটায় মাব পাশে বোস। খুব কোল ঘেঁষে। হ্যাঁ হাসিহাসি মুখে মার মুখের দিকে তাকা।

যেন পলিই মধ্যমণি।

যেন পলির জন্যেই এত সব আয়োজন।

সেইসব ফটোগুলো অবশ্য অ্যালবামে আঁটা আছে। কিন্তু এখন ওগুলোকে ও থেকে উপড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। 'পলি' নামের সেই মেয়েটার অবোধ সরলতাকে ভাঙিয়ে-ভাঙিয়ে খেয়েছে ওরা দিনের-পর-দিন, তার চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধি করেছে। মার সঙ্গে পলির লেপটেথাকা ওই ছবিগুলো তো তারই সাক্ষী।

কিছু আলো আর কিছু অন্ধকারের রহস্য জালটা বেঁধে মারত আমায়, কিন্তু সেই বেঁধে মারার যন্ত্রণাটাই আমায় তাড়াতাড়ি বড় করে তুলেছিল। তাই সেই ছোটবেলাতেই আমার চোখে পড়তে

লাগল, বিক্রম মামার সঙ্গে কথা কইবার সময় মার মুখে যেন একটা অলৌকিক আলো জ্বলে ওঠে, আবার ঠিক সেইরকম আলো জ্বলে ওঠে বিক্রম মামার সেই ঝাঁকড়া-চুলো বন্ধুটার, মায়ের সঙ্গে কথা কইতে।

আমার চোখে ধরা পড়তে লাগল, আমার জলপাইগুড়ির সেই দাদু যিনি কতকাল থেকে যেন শুধু বিছানাতেই কাটিয়ে আসছেন, তিনি তাঁর মেয়ের ওই আলো-আলো মুখের দিকে তাকালেই ভুরু কোঁচকাতেন। তাঁর লালচে মুখটা ফুলোফুলো লাগত।

অথচ আবার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেন খুব তোয়াজী ভাষায়।

ক্রমশই বুঝতে পারতে শুরু করলাম, মায়ের অবিরত চেষ্টা আমায় দাদুর কাছে বসিয়ে রাখবার, আর দাদুর অবিরত চেষ্টা আমাকে মার কাছে পাঠিয়ে দেবার।...কখনো-কখনো খুব সরলতার ভান করে দাদু আমায় যখন জিজ্ঞেস করতেন, মা কোথায়, কী করছেন, কার সঙ্গে গল্প করছেন, সেখানে আর কে কে আছে।...জিজ্ঞেস করতেন খাবার টেবিলে বাড়ির বাইরের কেউ যোগ দিয়েছিল কিনা কী কী রান্না হয়েছিল সেদিন।

'ভান'টা বুঝে ফেলতে পেরে যাচ্ছিলাম, আর বুঝতে পেরে যাচ্ছিলাম মেয়েকে নিয়ে তাঁর স্বস্তি নেই। কখনো-কখনো ওই 'ভান' নিয়েই আমাদের কলকাতার বাড়ির জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রশ্ন করে—করে যেন গভীর কোন রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করতেন দাদু। সব বুঝে ফেলতাম আমি অথচ এখন অনুভব করি, বুঝে ফেলবার বয়েস ছিল না সেটা।

না-বোঝবার বয়সে বুঝে ফেলা কী কষ্টকর।

কী দরকার ছিল সেই ছোট্ট মেয়েটার একথা বুঝে ফেলার, মালতীর ওই মাঝ রাত্তিরে হারিয়ে যাওয়ার রহস্যর পিছনে খারাপ কিছু আছে।

বুঝে ফেলেই তো তার কেবল কান্না পাচ্ছিল, আর মালতীর দিকে তাকাতে ভয় করছিল।

অথচ মালতী কিনা পরদিন সকালবেলা দিব্যি যথারীতি সেজেগুজে (সাজগোজটাই এ-সংসারের আইন। মালিকানীর পরিত্যক্ত দামী-দামী জমকালো শাড়ি ব্লাউজের সম্ভারে সব সময় নিজেকে সাজিয়ে রাখত সে। সাজিয়ে রাখতে হতো।) এক গাল হেসে বলে উঠল কিনা, কী খুকুরাণী, একটা রাতও মাকে ছেড়ে শুতে পারলে না? যেই একবার উঠেছি, অমনি পালিয়েছ?

কী আশ্চর্য!

কী ভয়ানক সাহস!

পলির মনে হলো হাতের কাছে যা পায় ওকে ছুঁড়ে মারে। পলির মনে হলো সেখান থেকে ছুটে চলে গিয়ে কোথাও বসে কাঁদে।...পলি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।...পলির কানে আসে মিসেস মুখার্জির চাঁচাছোলা কঠিন কঠোর গলা, মালতী পলির স্কুল ড্রেসটা আয়রণ করে রাখা হয়েছিল কাল?

পলির 'খারাপে' এত ঘৃণা। অথচ পলি নিজেই ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।...পলি সর্ব সময় উৎকর্ণ হয়ে থাকে কোথায় কী কথা হচ্ছে শোনবার জন্যে, পলি লেখাপড়া ফেলে আকাশপাতাল হাতড়ায় দুর্বোধ্য কথাগুলোর অর্থ আবিষ্কার করতে।

তোমাব ওই আয়াকে তবুও রাখা হবে?

মুখার্জি সাহেব পলিকে সাক্ষী রেখে এ-প্রশ্ন করতে যাননি তাঁর মেমসাহেবকে, তবু পলির কানে আসে আর সেটা কান থেকে মনে পৌঁছে টেপ হয়ে যায়।...

তোমার ওই আয়াকে তবুও রাখা হবে?

তবে কি ছাড়িয়ে দিতে হবে? তীক্ষ্ণ একটু হাসির শব্দ—অবশ্য এক ঘণ্টার মধ্যে যদি মালতীর মতো একটু সভ্যভব্য ট্রেনড্ আয়া যোগাড় করে আনবার গ্যারাণ্টি দিতে পার, তাহলে দিচ্ছি তাড়িয়ে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই চাই?

নিশ্চয়! অফ্‌কো-র্স্‌। ওকে না হলে এক ঘণ্টাও চালান শক্ত।

ওকে তাহলে তুমি সভ্যভব্য বলছ?

অবশ্যই।···ওর মতো টিপটপ, ওর মতো আদব-কায়দাদুরস্ত চাল-চলন জানা লোক তুমি ধারেকাছে কারোদের বার কর দিকি একটা!

আদব-কায়দা! বেয়াদব মানেটা তাহলে কী? কাল রাত্তিরের ঘটনাটা তাহলে কিছু নয়!

আমি অন্তত 'কিছু' বলে মনে করছি না। অত ছোটখাট ব্যাপারে নজর দিতে গেলে লোকজন রাখা যায় না।

অথচ দুধ চুরি করে খেয়েছে এই সন্দেহে তুমি আমার পুরন চাকর মাধবকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলে।

ঠিকই করা হয়েছিল। আমার স্বার্থে ঘা পড়লে আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

আর ঘা না পড়লে অনায়াসে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে? তোমার মর‍্যালিটির ধারণাটা তো অদ্ভুত!

থাক থাক তুমি আর মর‍্যালিটির কথা তুলতে এস না।···

সব কথা কি বোধগম্য হয়েছিল পলির?

হয়ত তখন হয়নি, কিন্তু হতে বেশিদিন দেরিও হয়নি।···সেই টেপ্‌টা মনের মধ্যে অনবরত পাক খেতে থাকত আর হঠাৎ-হঠাৎ এক-একটা দুর্বোধ্য কথা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যেত।···

এই পরিষ্কার হয়ে যাওয়াটাই এক-একটা হাতুড়ির আঘাত হেনে পলির শৈশবটাকে ছেঁচে-কুটে-পিষে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।

পলি শুধু তার শৈশবই হারিয়ে ফেলল না, হারিয়ে ফেলল তার মা-বাপকে। হারিয়ে ফেলল তার ঈশ্বরের দেওয়া পবিত্র আনন্দের মনটিকে।

সেই মনটাব জন্যে হঠাৎ-হঠাৎ কী কষ্টই হয় আমার।

মালতী কিন্তু থেকেই গেল।

মুখার্জি সাহেব কোনোদিনই ওর সঙ্গে কথা বলতেন না, সেদিনের আগেও না, পরেও না। দরকারও হতো না। বাড়ির যা-কিছু কাজকর্মের নির্দেশনা তো মিসেসই দ্যান! অর্থাৎ এ-যাবৎ দিয়েই আসছেন; কিন্তু সাহেব হঠাৎ একদিন একটা অসমসাহসিক কাজ

করে বসলেন, নিঃশব্দে ড্রাইভার হৃদয়রঞ্জন মাইতিকে বরখাস্ত করে নতুন এক ড্রাইভার বহাল করলেন। নাম—ব্রজরাজ, জাতে বেহারী পাকান গোঁফ, পায়ে নাগরা, বয়েস বছর পঞ্চাশ। হৃদয়রঞ্জনের কলকাতায় কোন আস্তানা নেই, তাই এ-বাড়িতেই খেত-শুত, ব্রজরাজের বাসা আছে। হৃদয়রঞ্জন 'বাবু বাবু' প্যাটার্নের তাই চাকরদের ঘরে না শুয়ে নীচেরতলার ড্রইং রুমটার মেঝেয় বিছানা বিছিয়ে শুত। তবে এত চটপটে যে, কেউ সে-দৃশ্য দেখতে পেত না। ভোরবেলাই বিছানা সরিয়ে ফেলে, নিজে সাফসুৎরো হয়ে পাটভাঙা পায়জামা শার্ট পরে রেডি।

ঘরঝাড়া চাকর সুরেশ এক-আধদিন লাগিয়ে দিতে এসেছিল, ড্রাইভার হৃদয়রঞ্জন সারারাত ফ্যান চালিয়ে ঘুমোয়।...সুরেশদেব ঘরে পাখা নেই, ওদের গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ওদের লাগানোতে কান দেননি মেমসাহেব। শুধু বলেছিলেন, তোমাদের মাথার ওপর একটা পাখা ঝোলান থাকলে তোমরাও চালাতে সারারাত।

অর্থাৎ হৃদয়রঞ্জন মিসেসের প্রশ্রয়পুষ্ট ছিল। থাকাই স্বাভাবিক।...মিস্টার মুখার্জিকে তো বহন করে তাঁর কোম্পানির গাড়ি, বাড়ির গাড়িটা মেমসাহেবের ব্যবহারের জন্য, আর মাইতি তার জন্য সর্বদা একপায়ে খাড়া।

একবার ডাক দিলেই হলো, 'মাইতি'—

তৎক্ষণাৎ গাড়ি গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে দরজায় বসে আছে।... মুখার্জি সাহেবের বন্ধু ও বন্ধুপত্নীরা মুগ্ধ, মুখার্জি মেমের ড্রাইভার-ভাগ্যে। কারণ তাঁদের ড্রাইভারদের না-কি রবিবারের ছুটি কম্পালসরি। নেহাত দায়ে-দৈবে পড়লে আলাদা টাকা দিতে হয়, 'ওভারটাইম' হিসেবে। তাছাড়া—তারা না-কি গাড়িকে ইচ্ছে করে খারাপ করে কারখানায় পাঠায়। কারখানার সঙ্গে না-কি শেয়ার থাকে, আরো সব কত কী।

মাইতি সম্পর্কে ওসব কথা ওঠেই না। মাইতি ছুটিও নেয় না।

কোনোদিন।...সদাহাস্য মুখ, সদাপ্রসাধিত স্মার্ট চালাক, কলকাতার রাস্তার নাড়ি-নক্ষত্রে অভিজ্ঞ এই লোককে কিনা বাড়ির মালিকানীকে না বলে-কয়ে বরখাস্ত করা ?

ব্রজরাজের ব্যাপারটা বোধগম্য হতে সময় লেগেছিল মিসেসের। প্রথমটা বেশ কয়েকবাব প্রশ্ন করেছিলেন তিনি, এ কে ? ও কোথা থেকে এল ? মাইতির কী হলো ?

মুখার্জি সাহেব ওই উত্তেজনার সামনেও শান্ত-ভূমিকায় থাকলেন, বিশেষ কিছু হয়নি তাব। শুধু চাকরিটা গেছে।

আমি জানতে চাই এব মানে কী ? এর মানে কী ?

মেমসাহেব ফায়ার থেকে ফায়াব হচ্ছিলেন, এবং অনবরত ওই একটাই প্রশ্ন করে চলেছিলেন। তখন তো আমি সেই 'পলি' যে পলি রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে দুটো ঘরের মাঝখানের দরজায় ঝোলানো ভারি মখমলের পর্দাটার দিকে। আর যদি সে পর্দার ওদিকে ক্রুদ্ধ গর্জন, আর চায়ের গেলাস ভাঙার শব্দ পায়, এই ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপে। তাই ওই আগুন-ঝরা মুখের দিকে তাকাতে পারেনি পলি, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

আমি জানতে চাই এর কারণ কী ? এর কারণ কী ?

ধরে নাও কোন কারণ নেই। কিংবা আছে কারণ।

সেটা আমায় একবার বলারও দরকার মনে হয়নি ?...

এটা আর এমন কী ব্যাপার ?

এমন কী ব্যাপার ! এমন কী ব্যাপার ! তার মানে এ-সংসারে আমার কোন পজিশান নেই। ঠিক আছে, বুঝে নিলাম। আমি চলে যাব।

কী আশ্চর্য। তাহলে তো আমাকে বাড়ি ছেড়েই থাকতে হয়। সংসারে কখন কী ঘটছে-না-ঘটছে আমি তো জানতেই পারি না। মাধব চলে যাবার দুদিন পরে জানতে পারলাম। যখন সে আমার অফিসে গিয়ে কেঁদে পড়ল।

ওঃ তার শোধ নেওয়া হচ্ছে তাহলে ?

মোটেই না। আমাব মনে হলো, এটা এমন কি একটা ব্যাপার ? ব্রজবাজ তো মাইতিব থেকে অনেক বেশি এক্সপার্ট। আমাদেব কোম্পানির গাড়ি চালিয়েছে কতদিন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি চলে যাব ব্যস।

সাহেবেব একটু হাসি শোনা গিযেছিল, চট কবে যেও না, ভাল দেখাবে না।

অসভ্য, ইতর, ছোটলোক।

মুখার্জি সাহেব হাসলেন।

ও-সব তো অনেক পুবনো বিশেষণ !

কেন ওকে ছাডান হলো, আমি বুঝতে পাবিনি ভেবেছ ?

কী অদ্ভুত জ্বলন্ত স্বব।

মনে হচ্ছিল, হঠাৎ বুঝি কোথাও আগুন ধবে যাবে।

বুঝতে পেরেছ ? তা হলে তো মিটেই গেল।

ওঃ। নীতিরত্ন মশাই এলেন ! অন্যেব বিচাব কবার আগে নিজের দিকে তাকিও। জান তোমাব ওই ভণ্ডামিব মুখোস খুলে দিতে পারি এখুনি।

কী আশ্চর্য, এখনো সেটা বাকি আছে না কি ?

কথা আর কথা।

কথার লডাই।

অসহ্য ! অসহ্য ! আজই চলে যাব আমি।

দোহাই তোমার, অন্তত আজই নয়। খুব খারাপ দেখাবে। লোকটাব নামটাও আবার গোলমেলে তো—

মেমসাহেব কী পা ঠুকলেন ?

দরজার পাশ থেকে দেখতে পাওয়া গেল না। শব্দের সঙ্গে যে কথাগুলো ছিটকে উঠল, তা হচ্ছে—'শয়তান', 'নীচ' 'নোংরা' 'বদমাইশ'।

নিশ্চিত ছিলাম, সেইদিনই চলে যাবেন উনি, কিন্তু গেলেন না।

কারণটা তখন বুঝতে পারিনি, পরে পেরেছি।

মুখার্জি সাহেবের ওই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গটুকুই কাজে লেগেছিল।

পলি তখন যে-বয়েসে যা না-বোঝবার, সেই বয়েসে তাই বুঝে ফেলাব যন্ত্রনায় ভুগছে। তাই বুঝে ফেলেছিল হৃদয়রঞ্জনকে ছাড়িয়ে দেবার কারণের সঙ্গে মালতীর সেই রাত্তিরে হারিয়ে যাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। কেউ ওকে কিছু বলেনি, তবু বুঝে ফেলেছিল।

ব্রজরাজকে খুব ভাল লেগেছিল পলির।

কেমন ভারি-ভারি গম্ভীর-গম্ভীর! কেমন গোঁফ আছে।... মাইতির মতো সবসময় পলিকে ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা করে না, সবসময় গান গায় না।

ব্রজরাজ, তুমি এখানে খাও না কেন? শোও না কেন? বাড়ি চলে যাও কেন?

পলির এই প্রশ্নে কিন্তু গম্ভীর-গম্ভীর লোকটাও হাসত, আমি ইয়া মোট্টা মোট্টা রোটি খাই, সে কেউ বানাতেই পারবে না।

আমি হীরালালকে বলে দেব, ইয়া ইয়া রোটি বানাবে।

ও হামি খাবেই না। হীরালাল তো মাছ রান্না করে, মুরগি রান্না করে। উসব হামি ছোঁয় না।

পলি আকাশ থেকে পড়ে যেন?

ওরা তো জানোয়ার আছে। ছাগল ভেড়া মুরগি শুয়োর—উ সব কেনো খাবো? হামায় তুমি কেটে রান্না করে ঝোল বানিয়ে খেতে পারো?

পলি হি হি করে হেসে ওঠে।

আহা কতদিন যেন পলি এমন করে হেসে ওঠেনি।...সব সময় অদ্ভুত একটা চাপের তলায় থাকতে হয় পলিকে। মালতী লোকের সামনে খুকুরাণী বলে আর লোকের আড়ালে সবসময় চোখ রাঙায়। সুরেশ আর মাইতির তো একমাত্র আমোদ পলিকে ক্ষ্যাপান, হীরালাল? সে তো রাগীর অবতার। রান্নাঘরে গিয়ে একটু ময়দা চাইলে কি একটু কড়াইশুঁটি চাইলে যেন মারতে

আসে, যাও যাও লেখাপড়া করগে না, কাজের সময় ব্যস্ত করতে এস না।···

বাকি দুজন মা আর বাবা।

মার কথা তো বলে কাজ নেই, একমাত্র বাবা। তখনো যিনি পলির কাছে দেবতাসম। তখনো পলি 'বাপী' বলে ডেকে বুক-ভরে নিশ্বাস নেয়।···কিন্তু তাঁকে আর পায় কখন পলি নামের নিঃসঙ্গ মেয়েটা; কাজ, ক্লাব, বন্ধুসমাগম এবং মেমসাহেবের সঙ্গে কথার লড়াইয়ের ফাঁকে কতটুকু সময় দিতে পারেন তিনি পলিকে, যাতে সে এমন প্রাণ খুলে হেসে উঠতে পারবার মতো পরিবেশ পায়?

ব্রজরাজের সঙ্গে কথা বলতে হি-হি করে হেসে ওঠে পলি, এ মা। তুমি জানোয়ার না কি?

তো জরুর জানোয়ার। যেমন বাঘ সিংহী বান্দর হাতি ঘোড়া কুকুর তেমন 'মানুষ'।

ধ্যেৎ!···খুশি হতে পারার স্বাদে উৎফুল্ল পলি ব্রজরাজের আরো কাছে সরে এসে বলে, মানুষের বুঝি চারটে পা?

ব্রজরাজ খৈনি টিপতে-টিপতে বলে, ওটা আগে ছিল। তো বান্দররা দুটো পা-কে হাত বানিয়ে নিতে চেষ্টা লাগাচ্ছে, আউর মানুষ ওটা করে ফেলেছে।···

তুমি ওটা কী খাচ্ছ?

ও কুছু না।

আমি খাব।

আঃ ছি ছি। এটা খারাপ জিনিস আছে।

তবে তুমি খাচ্ছ কেন?

হামি তো বড় আছি।

বড় হলে বুঝি খারাপ জিনিস খেতে হয়?

না না।

তবে?

ব্রজরাজ কথা ঘুরিয়ে ফেলত। ব্রজরাজ তার বাড়ির গল্প করত। সেখানে তার খুকুর মতো একটা নাতনী আছে। আর মেমসাহেবের মতো একটা মেয়ে আছে। তাছাড়া দুটো ছেলে আছে। চারটে মহিষ আছে। ভুট্টার খেত আছে, আর গমেরও খেত আছে। আর আছে বহোত্ বুঢ্ডা বাবা, আর একটু বুঢ়হি মা। রোটি পাকায় আর ব্রজরাজের বহু গোহু ভাঙে জাঁতায় পিষে-পিষে।

পলির মনে হয় সে যেন একটা স্বর্গরাজ্যের গল্প শুনছে।··· বাড়িতে এত এত লোক আছে কী মজা! কী মজা ব্রজরাজের সেই নাতনীর। যার নাম হচ্ছে যশোদা।

যশোদা ইস্কুল যায়?

নাঃ। কোখন যাবে? ওর মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে কাজ-কাম করতে হয় না ওকে?

পলি স্পন্দিতবক্ষে সেই সৌভাগ্যবতী যশোদার চেহারা আর পরিবেশটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে। পলি নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে-বসিয়ে দেখে

মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে কাজ করে বেড়াচ্ছে পলি, স্কুলে যেতে হচ্ছে না।

ব্রজরাজকে ভারি ভালবেসে ফেলেছিল পলি। বলা যায়, সে ভালবাসাটা প্রায় ভক্তির সমগোত্র। কিন্তু কাল হলো সেইখানেই। একদিন পলি হঠাৎ খেতে বসে মাংসের প্লেট সরিয়ে রেখে ঘোষণা করে বসল, সে জানোয়ার খাবে না।

জানোয়ার খাবে না।

এ আবার কোন্ ভাষা?

পলি কি পালি ভাষায় কথা বলতে শিখছে?

সুন্দর কাঁচের প্লেটে পরিবেশিত লালচে সোনালি ওই কোর্মার মধ্যে পলি জানোয়ারের ছায়া পেল কোথায়? এই ছায়ার মূল উৎস কী?

চটপটে সুরেশের উৎসাহে সেদিন সহজেই ওই অদ্ভুত ভাষার

আর অপ্রাকৃত ছায়ার মূল উৎস আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, ফলে যা অনিবার্য তাই হলো। ব্রজরাজের এ-বাড়ির অন্ন উঠল।

মেমসাহেব তিক্ত ব্যঙ্গের মুখে বলেছিলেন, মেয়ের সুশিক্ষার জন্যে আরো একটু ভাল ব্যবস্থা করতে পারতে, স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে ভাটপাড়ার টোলে পড়তে পাঠালে—বনেদটা কংক্রীটের হতো।

তুমি সামান্যকে 'অসামান্য' করে তুললে।

সেটা তোমার কাছ থেকেই শেখা।

আমাদের সম্পর্কটা কী অদ্ভুত সুন্দর! কেবল শোধ নেওয়া-নিইর পালা।

এ-অবস্থার জন্যে দায়ী কে সেটা ভেব।

পর্দা টেনে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যান মেমসাহেব। এটা ওঁর একটা প্যাটার্ন; যখন খুব বেশি রাগারাগি করবার পরিস্থিতি পান না, পর্দা টেনে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যান।

ছেলেবেলার 'বোধে'র জগৎটাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। খুব বড় একটা আয়নার সঙ্গে? একটা টেপরেকর্ডার যন্ত্রের সঙ্গে? অথবা ছাপাখানার সঙ্গে? অদ্ভুত এই ধারক যন্ত্রটা—বোধগম্য অবোধগম্য সবকিছুকে কী নিপুণ কৌশলেই না ধরে রাখে। সব ছবি সব কথা সব শব্দ।...কিছু হারায় না। আর ওই অজানা ভাষাটাও বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় হতে-হতে পাঠোদ্ধার হতে থাকে সেই একদার অবোধগম্য কথাগুলির।

মিস্টার এবং মিসেসের মধ্যেকার ওই কথার লড়াইয়ের অনেক কথাই তো তখন পলির অর্থহীন মনে হতো। তবু শব্দগুলো তো সমস্তই স্মৃতির ভাঁড়ারে জমা থেকেছে। আর দিনে-দিনে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলো অর্থ নিয়ে ধরা দিয়েছে।

জানি না সকলের এরকম হয় কিনা।

সোমা তো অনেক সময়ই অনেক প্রসঙ্গে বলে। কে জানে বাবা, অত মনে নেই। অত ছেলেবেলার কথা কি মনে থাকে?...বলে কি করে মনে থাকবে? তখন তো বাবা—মানেই বুঝতাম না সব কথার।

এ-কথা বেশি বলেছে তার ছোট পিসির প্রেম করা। এবং সেই প্রেমঘটিত বিয়ের ঘটনা নিয়ে।

সোমার মা মারা গেলেন। সোমা শিশুমাত্র, বাড়িতে শুধু সোমার বাবা এবং সোমার থেকে খানিকটামাত্র বড় দাদা, আর ফার্স্ট ইয়ারের পড়ুয়া ওই পিসি।...

এমন সুযোগময় পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার কে না করে? পিসি নিরঙ্কুশ অবাধ প্রেমচর্চা করেছে, প্রেমিক তরুণকে (সুযোগ পেলেই) বাড়িতে অবধি প্রবেশের অধিকার দিয়েছে। চা ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করার কোন ত্রুটি করেনি এবং অতঃপর 'ওকেই বিয়ে করব' অথবা ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না বলে ঝুলে পড়েছে।

তদবধি না কি পিসি গৃহচ্যুত। সোমার মাঝে-মাঝে ভীষণ মন কেমন করে অথচ ধর্মপ্রাণ বাবার সামনে এরকম অধর্মীয় 'মন কেমনে'র কথা প্রকাশ করতে সাহস করে না, কিন্তু মনে করতে পারে না কী ধরনের ছিল সেই প্রেমিক তরুণ! কী কথাবার্তা কইত তারা, চলে যে গেল পিসি কোথায় গেল।

ছেলেটা কী রকম দেখতে ছিল রে?

খুব সুন্দর।

লেখাপড়া করত?

তা তো জানি না।

আরে বাবা প্রেমালাপের ভাষাটা কিরকম চালাত বলতে পারবি না? তা হলেই বুঝে নিতে পারি কী চীজ্ সেটি।

ওমা, কোন্ ভাষায় কী আবার? বাংলা ভাষাতেই।

থাম। ন্যাকা।...রেগে উঠেছি আমি, একটুতেই রেগে ওঠা আমার স্বভাব। জানি এ-স্বভাবের জন্ম অসহিষ্ণুতা থেকে। আর সারাক্ষণ মনের ওপর চাপ থেকেই। তবু সামলাতে পারি না। বললাম, ডায়ালগের জাত কী? প্রকাশভঙ্গি কি রকম? ওয়ার্ডগুলো গাঁইয়া না সভ্য?

সোমা বলল, ও বাবা এখন সেইসব বলব? তখন সে-সবের মানে জানতাম?

তখন না জানিস, পরে বুঝতে পারিসনি?

না বাবা! মানে-না-বোঝা কথা আবার মনে থাকে না কি? তাই পরে বুঝতে বসব?

সোমার কাছে এটা অসম্ভব মনে হয়েছিল, কিন্তু পলির মনের শিলাখণ্ডে সব লিপি উৎকীর্ণ হয়ে থেকেছে। পরে পলির মধ্যে পাঠোদ্ধারেব কাজ চলেছে।

যত বড় হচ্ছিলাম, ততই এ-বাড়ির কর্তাগিন্নীর দাম্পত্য-জীবনের বিরাট শূন্যতাটা প্রকট হয়ে উঠছিল আমার চোখের সামনে। কী অদ্ভুত একটা সম্পর্ক নিয়ে জীবন-যাপন করে চলেছে এরা।...যেন দুই শত্রু-শিবিরের দুই পরাক্রান্ত সেনা হঠাৎ কোনো অবস্থা বিপর্যয়ে একই শিবিবে আশ্রয় নিয়ে বাধ্য হয়েছে।

তাই খাপের তলওয়ার সর্বদা খাপমুক্ত হবার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষমান, তূণে তীর সর্বদা মজুত, কোনো সময়ই শিথিলতার প্রশ্ন নেই।

অথচ বাইরের লোকেদের সামনে?

অতিথি অভ্যাগত বন্ধুজন আত্মীয়জন যখন আসেন?

অভিনয়ের উৎকর্ষের কী আশ্চর্য নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।... দর্শকের আসনে অবশ্য একজনই। সে একদা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে, আর তখন ঘৃণা অবজ্ঞা আর ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে অবলোকন করে থাকে সেই নাটক।...এ-নাটকে নায়িকার ভূমিকাটিই অধিক জোরালো। পুরুষ চরিত্রটি প্রায় পার্শ্বচরিত্র। তবে চালিয়েও তো যান—প্রেমে গদগদ পত্নীগতপ্রাণ বশংবদ স্বামীর 'রোল'টা। মোটামুটি উত্তীর্ণ ই হন।

আর নায়িকা?

কী অপূর্ব সেই অভিনয়।

সংসারের প্রেমে নিমজ্জিত স্বামী-সন্তানে বিগলিত, অথচ যেন

কৃত্রিম সংসার জ্বালায় জর্জরিত এক সুখি গৃহিণীর সেই ভূমিকায় কী নিপুণ উত্তরণ। অবাক হয়ে দেখবার মতো।

অনর্গল কথা বলছেন, অহেতুক হাসছেন, অপর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভার নিয়ে অতিথিকে পীড়াপীড়ি করছেন, কথায়-কথায় বান্ধবীর কর্তাভাগ্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং আপন কর্তাভাগ্যের কপট নিন্দায় শতমুখ হচ্ছেন, কী যেন এক অপদার্থ মাঝি নিয়ে তাঁকে এই সংসার তরণী বাইতে হচ্ছে তার বহুবিধ ফিরিস্তি দিয়ে-দিয়ে দুঃখ নিবেদন করে-করে রঙ্গভূমিতে সরস ভাব বান ডাকাচ্ছেন, আর হেসে গড়িয়ে পড়ে বলছেন, ডিভোর্স নেওয়া ছাড়া উপায় নেই আমার! দেখবেন একদিন। করবেই একদিন। জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে প্রতিদিন মনে হয় কোর্টে ছুটি

চোখে বিদ্যুৎ, ঠোঁটে লপাচাপলা, হাতের ভঙ্গিতে হতাশা। কী অনায়াস ভঙ্গিমা! কী স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।

আর কী অজস্র অনায়াস সংলাপ।

এই অভিনয় সবাই ঈর্ষাবিমিশ্রিত কৌতুকে উপভোগ করে।... সুখের কী অবধি আছে এই মুখার্জি দম্পতির? সকলেরই এই ধারণা। এ-সংসারের বহিরঙ্গের দৃশ্যটা তো এই ধারণারই সমর্থক।

এ-বাড়ির সিঁড়ির তলা থেকে ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত সাজানো। যে-সাজানো গৃহকর্ত্রীর রুচি আভিজাত্য সৌন্দর্যবোধ, আর গৃহকর্তার সচ্ছলতার আর অকৃপণ হাতের স্বাক্ষর বহন করছে।...সেই যে গান আছে—'এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা আছে—' এ-যেন প্রায় তাই।

তাছাড়া, -বাড়ির যাবতীয় ফার্নিচার থেকে শুরু করে পর্দা কুশন কভার বেডকভার কার্পেট পাপোশ, ফ্লাওয়ারভাস ল্যাম্প স্ট্যাণ্ড মূর্তি পুতুল ছবি, দেওয়ালসজ্জা, ক্যাকটাস, মানিপ্ল্যাণ্ট সব কিছুই আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাজার চলতি জিনিস নয়। এ বাড়ির সিঁড়ির দেওয়ালে যেসব বস্তু ঝোলানো থাকে, যেমন নেপালি থালা, তিব্বতি ঢাল-তলোয়ার, সিংহলি মুখোস, মণিপুরি মাদুর, কোথাকার যেন রঙিন পাখির পালক—তেমনটি মুখার্জি

সাহেবের ওই চেনা পরিচিতদের বাড়িতে মিলবে না এতে আমি স্থির নিশ্চিত।

দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের মধ্যে যে একটা বাহাদুরি আছে, সেই বাহাদুরিটির লোভেই মুখার্জি মেমসাহেবের দুরূহ চেষ্টা। মাঝে-মাঝেই অনেকদিন ধরে দেখা পুরনোগুলোর স্থানান্তর ঘটে, সেই শূন্যস্থানে নতুন সংযোজনের নিদর্শন ঝোলে।

অতএব বলা যায়, মেমসাহেব তাঁর সংসারটি সম্পর্কে উদাসীন তো নয়ই, বরং রীতিমতো সংসারপ্রেমীই।

এ-হেন মহিলা যখন তাঁর অভ্যাগতদেব সামনে মাথা দুলিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে ঘোষণা করেন, যে-কোনোদিন তিনি এই 'জ্বালাময়' সংসারটিকে ত্যাগ করে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যেতে পারেন তখন শ্রোতাবা ঈর্ষ্যাপীড়িতবক্ষে কৌতুক-নাটিকা দেখার রস উপভোগ করা ছাড়া আর কি করবেন?

বাইরের লোকরা চলে যাবার পর মুখার্জি সাহেবকে বেজায় ক্লান্ত দেখায়, ডানলোপিলোর গদিমোড়া সোফার মধ্যে এমনভাবে মুখ গুঁজে বসে থাকেন, দেখলে মনে হয় লোকটা বুঝি বসে-বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘাড়টা গুঁজে যায়, চিবুকটা বুকে ঠেকে, দুখানা হাত যেন নিরলম্বেব মতো দু-পাশে লেতিয়ে ঝুলে থাকে। চোখটা বোজা আছে কি খোলা আছে বোঝা যায় না

কিন্তু মেমসাহেবেব মূর্তি বিপরীত।

তিনি যেন অপেক্ষায় থাকেন, ওরা কতক্ষণে বিদায় নেবে। স্বামীকে একহাত নেবেন তিনি।

নেনও।

ওই বিধ্বস্ত মূর্তি মানুষটাকে ঠেলে-ঠেলে অভিযোগ চালিয়ে যান—কখন কোন্ কথাটা বলা উচিত হয়নি সাহেবের, কখন কোন্ অভিব্যক্তিটা নির্ভুল হয়নি, আর কী কী বোকামি প্রকাশ করে বসেছেন তিনি বাইরের লোকের সামনে।

আমি শুনে যাই। মজা দেখি। খুব অসহ্য লাগলে চটির শব্দ

করে ড্রইংরুমের দরজার সামনে দিয়ে অকারণ দু-চারবার আনাগোনা করি, আর অসম্ভব অসহ্য লাগলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে পর্দাটা সরিয়ে কড়া গলায় বলে উঠি, আপনাদের হয়েছে? না, দেরি আছে।

এই সাহসটা এখন আর দুঃসাহস বলে মনে করি না আমি, এমনকি সাহসই ভাবি না। এ এখন আমার কাছে ভাতজল হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যেদিন হঠাৎ এরকম সাহস করে বসেছিলাম? উঃ কী ভয়ানক অবস্থাই ঘটেছিল। থরথর করে কেঁপেছিলাম। নিজের ঘরে ফিরে এসে বুক ধরে বসে পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল যেন বাঘের সঙ্গে লড়াই করে এলাম, সাপের মাথায় পা চাপিয়ে এলাম, রাগী কুকুরের মুখ থেকে ফিরে এলাম। সে-কাঁপুনি থামতে যে কতক্ষণ লেগেছিল সেদিন—

অথবা বলতে হয় সে-রাত্তিরে—

পর্দাফেলা দরজার ওপারে চলছিল সেই একই কাণ্ড!

মেমসাহেবের চিৎকার গালাগালি, সারা ঘরে পায়চারির দাপা-দাপি।

আমি ভয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কান দুটো চাপা দিয়ে কেঁদে ওঠাটাকে থামাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ। ভারি কাঁচ। নিশ্চয়ই সেই গোল বলের মতো দেখতে সাদা ফ্লাওয়ারভাসটা।

হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা শক্তি এসে গেল।

প্রতিবাদ করবার শক্তি।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে পর্দা ঠেলে জোরে-ধাক্কা মারলাম চেপে-ভেজিয়ে-রাখা ভারি দরজাটায়। সঙ্গে-সঙ্গে হাট হয়ে খুলে গেল সেটা।

আমি ঘরে ঢুকে কোনোদিকে না তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, ভেবেছ কী তোমরা? ভেবেছ কী?'

হ্যাঁ তখনো 'তুমি' করেই কথা বলতাম ওনাদের। আর ওঁদের

সম্পর্কে ভাবতে গেলে 'মা' আর 'বাপি' বলেই ভাবনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতাম। 'সাহেব' 'মেমসাহেব' 'আপনি আজ্ঞে' এটা অনেক পরবর্তী স্টেজ।

বললাম, 'ভেবেছ কী তোমরা ?'

দেখলাম বাপি দু-হাতে মাথা চেপে বিছানায় বসে। আর মা সেই 'সেমিজটা' পরে ঘরের মাঝখানে খাড়া দাঁড়িয়ে। স্যাম্পু-করা ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো সাপের ফণার মতো মুখের দু-ধারে দুলছে।

আমার হঠাৎ ঢুকে পড়ার ধাক্কায় তিনি সহসা থেমে পড়েছিলেন, দুবার প্রশ্নের পর তীক্ষ্ণগলায় বলে উঠলেন, তুমি কী করতে এখানে এসেছ ?

সেই যে একটা কথা আছে না, সাহসই সাহসের জন্মদাতা। সেটা ঠিক। তাই ওই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সামনে সেই ফ্রকপরা মেয়েটা জোরালো গলায় বলে উঠল, বাড়িতে কেউ ঘুমোবে না ? আর এরকম হলে আমি এ-বাড়িতে থাকব না। রাস্তায় বেরিয়ে যাব। যেখানে ইচ্ছে চলে যাব।

থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে চলে এলাম। বুক ধরে বসে পড়লাম। কী বলে এসেছি ঠিক সেই মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না।

আশ্চর্য ! হঠাৎ যেন বিশ্বচরাচরে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল সে-রাত্রে।···সেই স্তব্ধতা সকালেও।

কিন্তু তারপর থেকে কি রাত্রির কলহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ? বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে না, তবে তেমন মাত্রা ছাড়াতেন না আর ক্রমশই সেই খরগোসছানার মতো ভীরু পলির মধ্যে থেকে আর এক 'পলি' জন্ম নিচ্ছিল। এর মধ্যে আর ভয় নামক অনুভূতিটা আর উঁকি মারে না, এ-মেয়ে দিনের বেলাতেও মা-বাপের কথার লড়াই শুরু হলেই হাততালি দিয়ে ওঠে 'নারদ নারদ !'

এই 'নারদ নারদটা' সুরেশের কাছ থেকে শিখে ফেলেছিল।

পলি। হীরালালের সঙ্গে বাসন মাজা ঝি সুবাসিনীর কেন জানি না যখন-তখন ঝগড়া লেগে যেত, আর ঝগড়া লাগলেই সুরেশ বলে উঠত, 'নারদ নারদ!'

নারদ না কি ঝগড়ার দেবতা।

তা এই জ্ঞানটি অর্জন করে ফেলে সেটা কাজে লাগাত পলি। আর খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখতে পেত ওঁরা কেমন যেন নিরুপায় নিরুপায়ভাবে মিইয়ে যেতেন।

কী করবেন? এতটা বড় হয়ে যাওয়া মেয়েকে তো আর লোকজনের সামনে ধরে মারতে পারেন না? কত বকবেন? কত চেঁচাবেন? সে তো অগ্রাহ্য করছে সেগুলো?

তখনও পলির মধ্যে তেমন দুর্দান্ত ঘৃণা জন্মায়নি। তখনো পলি অনেক কিছু সম্পর্কেই অনবহিত ছিল। পলি শুধু তখন টের পেয়ে গিয়েছিল এরা একটা জায়গায় জব্দ। সেটা হচ্ছে—মেয়ে যতই দুর্বিনীত অসভ্য বেপরোয়া জ্বালাতুনে হোক, মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না, ধরে মারতে পারবেন না, খেতে দেব না পরতে দেব না বলে শাসন করতে পারবেন না।

ওই দুর্ধর্ষ পাজি অবাধ্য মেয়েকেও দামি স্কুলে পড়তে পাঠাতে হবে, দামি-দামি পোশাক দিয়ে সাজাতে হবে, সে মেয়েকে নাচ শেখাতে হবে, গান শেখাতে হবে, সাঁতার শেখাতে হবে, স্পোর্টসে নামাতে হবে, এক-কথায় তাঁদের একমাত্র কন্যাকে সর্ববিদ্যায় পটিয়সী করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। তা নইলে তাঁদের সমাজে তাঁদের মুখ থাকবে না। ছেলেমেয়েই তো মা-বাপের স্ট্যাটাসের ধারক-বাহক। আর একটা ভয় পলি যদি সত্যিই রাগ করে কোথাও চলে যায়।

এইটা বুঝে ফেলার পর থেকেই পলি 'মেয়ে দুঃশাসন' হয়ে উঠতে লাগল। পলি অনায়াসেই হাততালি দিয়ে 'নারদ নারদ' বলে উঠে হি-হি করে বলতে পারত, 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস' চালিয়ে যান, চালিয়ে যান। এখন আপনাদের যথেচ্ছ অসভ্যতার স্বাধীনতা

দেওয়া হচ্ছে। আপনাদের স্টকের সমস্ত গালাগালিগুলো দিনের বেলার মধ্যেই সেরে ফেলুন, রাতের জন্য তুলে রাখবেন না।'

উঃ কী নিরুপায় আক্রোশের দৃষ্টিতেই তাকাতেন মহিলা আমার দিকে। আর কী কঠিন চেষ্টায় সেই আক্রোশের দৃষ্টিকে মোলায়েম করে তুলতেন, যখন মেয়েটা পাঁচজনের সামনে গান গাইতে বললেই ইচ্ছে করে তানের ভুল করত. ইচ্ছে করে বেসুরো গাইত। আর নাচ দেখাতে চাইলে বলত, 'ওবে বাবা, পায়ে দারুণ ব্যথা।'

...আর আরো কত কঠিন হতো সেই মাথা জ্বালা-করা রাগকে চেপে ফেলে, অন্যদের সামনে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা-করা, মেয়েটার এই দুষ্টুমিটা নেহাতই বাচ্চামি!

মাঝে-মাঝে বাবা ওনার আড়ালে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করতেন প্রশ্ন করে জানতে চাইতেন, আমি ইচ্ছে করে কেন অমন করি।... সে-সময় বেচারি ভদ্রলোকের উপর একটু যে মায়া হতো না তা নয়, ওই অন্তরঙ্গতার কাছে ধরা দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হতো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর মিসেসের কাছের বশংবদ মূর্তিটি মনে পড়ে গিয়ে সেই মায়ামায়া মন স্রেফ মরুভূমি হয়ে যেত।

বশংবদ বৈকি।

কথার লড়াই ছিল অবশ্য, সেটা স্বভাবগত, হয়তো বা না করে পারতেন না বলেই, কিন্তু শেষ অবধি একই ব্যক্তির পরাজয় ঘটার দৃশ্যও ছিল। শেষ পর্যন্ত 'সারেণ্ডার।' অতঃপর মিসেসের মেজাজ প্রসন্ন রাখবার চেষ্টা।...এই কুৎসিত দৃশ্য থেকেই ঘৃণার শুরু। কিন্তু ক্রমশ এটাই বুঝে ফেললাম, মিসেস মুখার্জি যে-কারণে তাঁর মেয়ের ক্রূর দুর্বিনীত আচরণের কাছে নিরুপায়, ঠিক সেই-কারণেই মিস্টার মুখার্জি নিরুপায় তাঁর দুর্বিনীত স্ত্রীর আচরণের কাছে।

তবুও জেনে-বুঝেও বাপির ওপর থেকে মমতা চলে যাচ্ছিল, সেই দেবতা-দেবতা ভাবটা লোপ পেয়ে যাচ্ছিল।...তিনি যখন নিভৃতে আমায় বোঝাতে বসতেন, আমি 'ইনোসেন্ট ইনোসেন্ট' মুখ

তুলে বলতাম, 'আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, আপনার উপদেশ মনে রাখব।'

বাপি আহত হয়ে বলতেন, এভাবে কথা বলছিস কেন ?

উত্তর দিতাম, মা-বাপকে মান্য করে কথা বলাই তো ভাল মিস্টার মুখার্জি !...

প্রথম-প্রথম তিনি এগুলোকে বালসুলভ চপলতা ভেবে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন, ক্রমেই সে-চেষ্টাটা ছাড়তে হলো।...মেয়ের চোখে অবজ্ঞা আর অগ্রাহ্যর দৃষ্টি দেখে তিনি আর জিগ্যেস করতে চেষ্টা করলেন না, হ্যাঁরে তুই এমন অদ্ভুত ব্যবহার করিস কেন?... বলতে আসতেন না—বাইরের লোকের সামনে বাড়ির লোককে অপদস্থ করা ভাল কী ? লোকে সেটা বুঝতে পারলে তোকেই তো নিন্দে করবে।

হ্যাঁ এসব বলা ছেড়ে দিলেন তিনি।

তাঁর মেয়ে যখন আরো 'ইনোসেন্ট' ভঙ্গিতে প্রতি-প্রশ্ন করলো, এতো সুক্ষ্ম ব্যাপার বুঝতে পারবার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি কি আপনার ওই বিনি পয়সায় বীয়ার খাবার লোভে ছুটে-আসা বন্ধুদের আছে বলে মনে হয় আপনার মুখার্জি সাহেব ?

তখন থেকেই তিনি তাঁর সেই 'অন্তরঙ্গ' হবার বাসনায় ব্যাকুল অন্তরকে গুটিয়ে নিলেন।

পলির কি কষ্ট হতো না ?

পলির কি বুকের মধ্যে অজানা একটা যন্ত্রনা হতো না? কিন্তু কী করবে পলি ? তার ভাগ্যই তাকে ওইভাবে মরুভূমিতে আছড়ে আছড়ে মেরে কাঠ করে ফেলছিল।

কী অসুবিধে হতো ভগবানের যদি পলিকে তিনি মীরাদের বাড়িতে জন্মাতে পাঠাতেন তাদের তিন বোনের একজন করে!... মীরাদের বাড়িতে আমি কোনোদিন যাইনি, কিন্তু—সোমার মুখে শুনে-শুনে ওদের সব কথা জানা হয়ে গেছে আমার।

আমি জানি মীরার বাবার মাইনে কম, মীরারা পাঁচ ভাই-বোন, তাদের খাওয়াতে-পরাতে স্কুল-কলেজের খরচ যোগাতে হাড় কালি

হয়ে যায় দুটি মানুষের।...মীরার বাবা—ভোরবেলা উঠে দুধ আনতে যান, এসেই একটু চা খেয়ে ছোটেন বাজারে। বাজার থেকে ফিরেই পড়াতে বসেন ছেলে-মেয়েদের আবার ঠিকমতো সময়ে উঠে পড়ে স্নানাহার করে অফিস ছোটেন।

ওরই মধ্যেই নিজের জুতো নিজে পালিশ করে নেন, নিজের জামা-কাপড় নিজে সাফ করেন, আর সেকেণ্ড-ক্লাশ ট্রামে চেপে অফিস যান।

মীরার মাও ভোর থেকে শুরু করে দেন—সেইসব কাজের বস্তা নিয়ে। যেসব কাজ আমাদের সুবাসিনী করে, সুরেশ করে, হীরালাল করে।

সবই না-কি উনি একা করেন, মেয়েদের পড়ার ক্ষতি হবে বলে তাদের কাজে ডাকেন না।...তবু না-কি তারা মায়ের কষ্ট কমাতে তরকারি কুটে দেয়, রুটি বেলে দেয়, চা বানায়, ভিজে কাপড় শুকোতে দেয় আবার শুকিয়ে গেলে তোলে।...

কি-জানি কীভাবে ওইসব কাজগুলো করে তারা। আমি কোনোদিন দেখিনি কাজগুলো।

সোমা বলতো, বাবা তুই এমন মন দিয়ে মীরাদের গল্প শুনিস যেন কী-এক পরীরাজ্যের কথা শুনছিস।

তখন পলির অহমিকায় ঘা পড়তো।

পলি বলতো, গরিব গেরস্তর বাড়ি তো কখনো দেখিনি, তাই জেনে নিচ্ছি, গল্প লিখব ওদের নিয়ে।

ওমা, গল্প লিখবি ? তুই ?

লিখব কেন, লিখিই তো।

পলি তাচ্ছিল্যের গলায় বলতো, গল্প লেখা আবার কী এমন শক্ত? যা-কিছু দেখছিস শুনছিস, সেইগুলো গুছিয়ে লিখতে পারলেই গল্প।

ঝগড়া ? এমা না না—

সোমা বলেছে, জন্মেও না। মীরার বাবা যেমনি ভালমানুষ,

মীরার মা তেমনি হাসিখুশি মানুষ। ওঁরা ঝগড়া করছেন ভাবাই যায় না।

পলির কী তখন কাঁদতে ইচ্ছে করে না?

পলি যদি ওই মীরা-ধীরা-ইরাদের একজন হতো, পলি কি ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে-করে নিজেকে এমন নষ্ট করতো?

কিন্তু সে-পলি তো অনেকদিন হলো মরে গেছে।...যেদিন পলি সাপের ছোবল খেয়েছে, সেইদিন থেকেই তিলে-তিলে মরছে।

এখনকার পলি তার মা চিরতরে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে বুঝেও একবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় না।...বরং শুনিয়ে-শুনিয়ে বলে হ্যাংলার মতো বেরোবো কেন?

এ-পলি মনে-মনেও কোনো সময়ই আর তার মা-বাপকে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস, অথবা সাহেব এবং মেমসাহেব ছাড়া কিছু ভাবে না।

গাড়ি ছেড়ে দেবার শব্দ পাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে বসেছিলাম, হঠাৎ মনে হলো এটা আবার 'বিরহ-বিচ্ছেদ' যন্ত্রনার মতো দেখতে লাগছে না তো?...উঠে পড়লাম—জোর গলায় ডাকলাম, হীরালাল! চা কই?

মুখার্জি সাহেব

মিলি চলে গেল।

এমন অনেকবারই চলে যায় ও, বলে যায় 'আর আসবো না', তা আবার ফিরে আসে। যদিও ওই ফিরে আসাটার পিছনে আমার অবদানও কম থাকে না।...আমাকে জানাতে হয়—মিলির অভাবে এখানে খুব অসুবিধে হচ্ছে, যত্নের অভাবে পলির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে

যাচ্ছে লোকজনেরা যথেচ্ছাচার করছে, চুরিটুরি তো করছেই দোহাত্তা···ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদিও কথাগুলো একেবারে অমূলক নয়, ওর সদা ক্রুদ্ধ মূর্তির উপস্থিতিও সংসারে প্রাণের প্রবাহ ঘটায়, লোকজন সায়েস্তা থাকে এবং পলি একে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করুক, ওর অদৃশ্য হাত পলির স্বাস্থ্যকে মজবুত রাখতে সহায়তা করে। তবু শুধু এইসবের জন্যেই কি কাতরতা জানাতে যেতাম আমি? যদি না বুঝতে পারতাম—ক্রমশ ও ওর প্রাণের জলপাইগুড়িতেও হাঁপিয়ে উঠছে। হাঁপিয়ে উঠতেই হবে। যতই উদ্দাম উন্মাদ হয়ে ছুটে চলে যাক, বেশিদিন টিকতে পারে না। অভ্যস্ত আরাম আয়েসের অভাব ওকে অস্থির করে তোলে। সেখানে আহ্লাদ আছে আরাম নেই। আর আরামের অভ্যাসটা তো একটা প্রবল শক্তি অদৃশ্য শত্রুর মতো ওই অভ্যাসটি যে কেমন করে ধীরে-ধীরে একেবারে করতলগত বশ্যপ্রাণীতে পরিণত করে নিয়ে কব্জা করে ফেলে, টের পাওয়া যায় না।

মৃণালিনীর মস্ত বিজনেসম্যান বাবার সংসারে টাকা-পয়সার অভাব নেই, কিন্তু সে টাকা-পয়সার সদ্ব্যয়ের সুব্যবস্থা নেই। ওদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি মান্ধাতার যুগের। যদিও ওদের বলতে মাত্র সেই অনড়-অচল বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর অতিমাত্রায় সচল-সনড় 'বিক্রম রায়।' তবু শুনতে তো পাওয়া যায়, একটা বেড়ালের ল্যাজে টাকা বেঁধে দিলেও সে বিলেত ঘুরে আসতে পারে। তবে?

আসলে প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণারই অভাব।

ওরা গরমে মরে গেলেও, ঘরে একটা 'এয়ারকুলার' পর্যন্ত বসানোর কথা ভাবতে পারে না, পাখাটাকে ফুল স্পীডে ঘোরানোই ওদের আরামের শেষ-কথা। আবার হাড় কাঁপানো শীতের সময়ের জন্যে ব্যবস্থার শেষ-কথা—উঠোনের একধারে দাউ-দাউ করে কাঠ জ্বেলে ক্যানেস্ত্রা-ক্যানেস্ত্রা জল গরম করা। স্নানের ঘরে একটা 'গীজার' বসানোর কথা চিন্তাতেও আনতে পারে না।···এখনো

ওদের রান্নাঘরে কয়লার গনগনে আগুনের আধিপত্য, আর সে রান্নাঘরের অধিষ্ঠাতা দেবতার গলায় একটা পৈতে থাকা আবশ্যক বলে তার ছিমছাম ফিটফাট চেহারা বা সাজসজ্জার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ওরা টেবিল চেয়ারে খায় বটে, কিন্তু কাঁসার থালা বাটিতে। আরো কত কি ছোটখাটো ব্যাপার আছে।

এসব বেশিদিন সহ্য করে চলা মিলির পক্ষে শক্ত বৈকি।

যদিও, 'ওরা' বলতে ওই বিক্রম, কর্তা তো ঘরে খান। মিলি গেলে তবে 'রা' হয়। বিক্রম তো সংসারি হলো না জীবনে। হবে কি জীবনের প্রারম্ভে যে সাপের ছোবল খেয়ে বসে আছে।···তার থেকে নিস্তার কোথা? সে যাক—

নিজে থেকে তো মান খুইয়ে চলে আসতে পারবে না মিলি। তার 'অহমিকা'র মর্যাদা বজায় রাখতে আমাকেই সেটা খোয়াতে হয়। উপায় কী? মিলি কষ্ট পাচ্ছে এটা ভাবতে আমার সত্যিই কষ্ট হয়।

যদিও অহরহই ও কষ্ট পায়।

কষ্ট পাওয়াই ওর বিধিলিপি।

ওর বাবার ব্রাহ্মণ্যগর্ব ওকে প্রার্থিত জীবন পেতে দেয়নি। বিক্রম ওর ভাই নয় ওর বাবার পালিত পোষ্যমাত্র, তবু ওকে বঞ্চিত হতে হয়েছে।···বিক্রম নিতান্ত শৈশবে বিধবা মায়ের সঙ্গে এ-সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল। বিক্রমের মা মরেছে, ও রয়ে গেছে। কিন্তু শুধু কি রয়েই গেছে? ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে এখন কি সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেনি? ব্রজেন চ্যাটার্জির কাঠের আর মধুর ব্যবসার আসল মালিক যে এখন বিক্রম রায় এ-কথা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে কে না জানে?···আর জানে ব্রজেন চ্যাটার্জি বিক্রম রায়ের 'মামা'।

আর বিক্রম রায় ব্রজেন চ্যাটার্জির?

বোধ করি, 'গুরু, ইষ্ট, মা-বাপ, রক্ষক সেবক আশ্রয় অভ্যাস জীবন সমুদ্রের ভেলা, সংসার তরণীর মাঝি।···পক্ষাঘাতগ্রস্ত ওই ভদ্রলোক বিক্রমের উপর ভর করেই ব্যবসাটাকে এখনো পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন।

অথচ, তাঁর মেয়ের জীবনে লোকটা যে কী স্থান অধিকার করে বসে আছে, তা খেয়াল করে তাকিয়ে দেখেননি।...

ব্রাহ্মণ্যগর্বের মোহ অঞ্জন ?

না-কি লোকলজ্জার প্রশ্ন ? যে-লোক এযাবৎ আশ্রিতের ভূমিকায় রয়েছে, এবং একই বাড়িতে রয়েছে, তাকে হঠাৎ জামাই করে বসলে পাঁচজনে কী ভাববে ? ভাবার তো জাতপাত নেই, অনায়াসেই ভাবতে পারে বিয়েটা বাধ্য হয়েই দিতে হচ্ছে। অতএব ব্রজেন চ্যাটার্জি ওদের ভালবাসার জাত নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন না। 'ভাইবোনের মতো মানুষ' হয়েছে, অতএব ভাইবোনের মতোই বলে চেপে রাখলেন। এইসব আত্মকেন্দ্রিক লোকেদের দশা উটপাখির মতো। এরা সূর্যকে অস্বীকার করতে বালির গাদায় আশ্রয় নেয়।

তবে 'বিক্রম' নামের ওই ছেলেটাকে আমি নিন্দে করতে পারি না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও। ওতো অনায়াসেই ওই পঙ্গু ব্যক্তিটিকে সরিয়ে ফেলে যথার্থই যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করতে পারতো, কিন্তু করেনি তো!

যদিও জানি করেনি কার কথা ভেবে ?

মিলি।

মৃণালিনী।

যার জন্যে সে জীবনকে বিকিয়ে বসে আছে।...কিন্তু ওই বিকিয়ে বসার মধ্যে আত্মনিবেদনের কাব্যমণ্ডিত ললিত মসৃণ সুরের বালাই নেই। 'প্রাবল্য'ই ওর একমাত্র সুর।

আসলে লোকটা 'রাফ্'। আর অবিরত কুলি-মজুর খাটিয়ে খাটিয়ে আরো রুক্ষ তীব্র। ও ব্রজেন চ্যাটার্জির স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হলে, তাঁকেই ধমক দেয়, ঔষধপথ্যের ব্যাপারে নিষ্ঠা শেখাতে খিঁচোয়, আর তাঁর কোনো নির্দেশ মানতে ইচ্ছে না হলে অনায়াসেই বলে, ঠিক আছে, আপনিই দেখুন এবার থেকে, আমারও আর এভাবে পড়ে থাকতে ভাল লাগছে না।

'মামা' না কি তার বিয়ের জন্যেও নির্বেদ প্রকাশ করেছিলেন বেশ কিছুদিন, ও সে-নির্বেদকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

'সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবার শখ আমার নেই মামা।' পাগলে ছাড়া বিয়ে করে না, এই তার অভিমত। অর্থাৎ মিলিই আছে তার জীবন জুড়ে। ওর ওর ভালবাসার মধ্যে যা প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে প্রখর আবেগের প্রবল দাবি। ওই প্রাবল্যের কাছে 'মিলি' নামের আবাসা মোহগ্রস্ত সমর্পিতপ্রাণ মেয়েটা খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। তাই যখনি মোটা-মোটা খামে চিঠি আসে জলপাইগুড়ি থেকে, তখনই ও যেন উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ হয়ে ওঠে। তখন প্রতিটি ব্যাপারে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, আর আমার প্রতিটি ব্যবহারের ভুল অর্থ আবিষ্কার করে-করে তুলকালাম বাধায়।

ওর এই প্রলয় কাণ্ড বাধানোটা যে দিশেহারা মনের উত্তাল যন্ত্রনাটাকে বার করে ফেলার একটা উপায় মাত্র, সেটা বুঝতে আমার দেরি হয় না, হয়নিও কোনোদিন সেই বিয়ের সময় থেকেই বুঝে ফেলেছিলাম। বর কনে বিদায়ের মুহূর্তে ও সেই বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারব না বলে যে দুরন্ত কান্নার বন্যা বইয়ে দরজার পাল্লা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, সেটা যে খুব স্বাভাবিক নয় তা আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝেছিলাম।

হয়তো বুঝতাম না, হয়তো শৈশবে মাতৃহীন মেয়ের এই ব্যাকুলতাকে বাড়াবাড়ি ভাবলেও, অস্বাভাবিক ভাবতাম না, যদি বিয়ের রাত্রে বাসরে আসরে বিক্রমের চোখের দিকে আমার চোখ না পড়তো।...

সেই হিংস্র জ্বলন্ত ক্ষুধার্ত চোখ দুটোর ভাষা ছিল স্পষ্ট প্রাঞ্জল!

সেই ভাষা থেকেই আমার ভাগ্যলিপি পড়ে ফেলেছিলাম। আমার ভাগ্যে সে জঙ্গলে ফুটে থাকা একখানি অনাঘ্রাত কুসুম জোটেনি, তা বুঝে গিয়েছিলাম।

তবে খুব বেশি দমে যাইনি, নিজের সম্বন্ধে মূল্যবোধ ছিল প্রবল, এই উচ্চশিক্ষার ছাপহীন তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে অপরাজেয় বলে মনে

হয়নি। মনে হয়েছিল মাতৃহীন সংসারে এহেন পরিবেশে এ-ধরনের ঘটনা ঘটাই তো স্বাভাবিক। পরিবেশমুক্ত হলেই মোহমুক্তি ঘটবে।

ব্রজেন চ্যাটার্জি তাঁর ব্যবসার একাধারে ম্যানেজার হিসেব রক্ষক, সুপারভাইজার এবং পরামর্শদাতা উপদেষ্টা ছুই বিক্রম রায়কে 'ভাগ্নে' বলে পরিচয় দিলেও, যে সত্যি তা নয়, তাও সেই বিয়ের আসরেই জেনে ফেলা হয়ে গিয়েছিল আমার। বর কলকাতার, তাই তাকে একদিন আগে নিয়ে এসে বাড়িতে পুরে ফেলা হয়েছিল, পাছে দৈবের যোগসাজসে কোনো বিভ্রাট ঘটে। ট্রেন বিভ্রাট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ শারীরিক অসুখ কত কী-ই ঘটতে পারে। কন্যাদায় বলে কথা। কত দিক ভাবতে হয়।

বিয়ের আগের দিন কন্যাকর্তার হেফাজতে আসতে হয়েছিল, এবং বিয়ের সব আচার অনুষ্ঠান সমাধা করে তবে ছুটি পেয়েছিলাম।

ব্রজেন চ্যাটার্জি তো আর তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়, 'টগবগে যুবা' বললেই হয়। একমাত্র মেয়ের বিয়েতে সমারোহের যা আয়োজন করেছিলেন, তা এ-অঞ্চলের লোকের দীর্ঘকাল মনে রাখবার মতো।

স্বপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ।

বহু দুঃখের আর বঞ্চনার সমুদ্র পার হয়ে প্রতিষ্ঠার সিংহ দরজার চাবিকাঠিটি পেয়ে গিয়েছিলেন। এইসব মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না, তাই এই সমারোহের অন্তরালে সেই সমারোহের 'প্রাণকেন্দ্রটি'র প্রাণের দিকে চোখ পড়েনি ভদ্রলোকের।···তিনি বসে-বসে কেবল সমারোহের আয়োজনের, আর নিমন্ত্রিতের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। শৈশবে মা-বাপ মরা অভাগা ব্রজেনকে যেসব আত্মীয়রা 'দেখেনি' আজ তাদের চোখের সামনে নিজেকে 'দেখাবার' তীব্র বাসনা তাঁকে খাটিয়ে মেরেছে।

দূরদূরান্তর থেকে আসা দূরদূরান্তের আত্মীয়জনেরাও ব্রজেনের মেয়ের বিয়েতে এসে পাঁচ-সাতদিন ধরে বাড়ি জমজমাট রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিতৈষীর তো অভাব ছিল না। তাঁরা আসল মালিককে

কায়দা করতে না পেরে ভাবী মালিককেই সুপরামর্শ দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁদের মোটামুটি বক্তব্য এই, আমি যেন আমার নিজের দাবিদাওয়া সম্পর্কে সচেতন থাকি, যেন ভুলে না যাই চ্যাটার্জি কোম্পানির ওই মধু আর কাঠের বিরাট ব্যবসাটার প্রকৃত মালিক এখন থেকে আমিই, মিলির মাধ্যমেই অবশ্য। কিন্তু মিলি কী জানে? কী পারবে? বাপে-মেয়েতে তো ওই ধূর্ত বিক্রম রায়কে বিশ্বাস করে যথাসর্বস্ব তার হাতে সমর্পণ করে বসে আছে। যেন ভগবানকেই দিয়ে বসে আছে স্রেফ মোহগ্রস্তের মতো।

কিন্তু এমন ক্ষেত্রে রক্ষকই যে ভক্ষকের ভূমিকা নেয়। এমন নজিরের তো অভাব নেই জগতে? ভুরিভুরি নজির আছে। অতএব আমাকেই মোহমুক্ত দৃষ্টিতে অবস্থাটা অবলোকন করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

হিতৈষীজনের এই সুপরামর্শে আমি মনে-মনে উচ্চহাসি হেসে-ছিলাম। ব্রজেন চ্যাটার্জির বিষয়-সম্পত্তি তার রক্ষকের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে—আমি কি উত্তরবঙ্গের ওই জঙ্গলে পড়ে থাকব?

আরও একটু হাসি পেয়েছিল ব্রজেন চ্যাটার্জির বিজনেসের বিষয়বস্তু নির্বাচনের বাহাদুরিতে।

কাঠ আর মধু।

কী অদ্ভুত বিপরীত দুটো বস্তুর একই ছত্রতলে সহাবস্থান।

শেষপর্যন্ত অবশ্য বাবার নির্বেদেই বাবাকে ছেড়ে চলে আসতে হলো মিলিকে। বলতে কি প্রায় বকুনিই খেয়ে।

'এরকম করলে জীবনে আর কখনো আমার স্নেহ পাবে না তুমি—' বলে মুখ ফিরিয়ে সরে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

নিজেকে বেশ অপরাধী-অপরাধীই লাগছিল।...কিন্তু উপায় কী? এ-কথা তো বলা যাবে না—

'থাক। জোর করে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।'

মিলি আমার ঘরে এল।

মানে বলতে পারা যায়—মিলি নামের মেয়েটার শরীরটা অনেক গহনা-কাপড়ে মোড়া হয়ে আমার ঘরে এল। দেখলাম তার প্রাণ-মন আত্মা-সত্তা আবেগ-আনন্দ সবকিছু সে রেখে এসেছে সেখানে। তার মানে আমার প্রতিপক্ষ সেই উচ্চশিক্ষার ছাপবিহীন মেঠো বিক্রম রায় নয়, প্রতিপক্ষ স্বয়ং মৃণালিনী দেবী।

অতএব নিজের বিজয়লাভ সম্পর্কে যতটা নিশ্চিত নিশ্চিন্ততা বোধ করেছিলাম তেমনটি রইল না।

সদ্য বিবাহিত কোনো পুরুষের পক্ষে এ-অবস্থাটা অবশ্যই সুখকর নয়। ঈর্ষ্যাজর্জরিত হওয়াই স্বাভাবিক, কঠোর হওয়াই উচিত, কিন্তু কেন জানি না, রাগের বদলে তো মমতাই এল আমার। মনে হলো আহা ওর বাপের এটা বোঝা উচিত ছিল।

আরো মমতা এল, হয়তো ওর অভিনয় চেষ্টা দেখে।

আপ্রাণ অভিনয় করেছিল ও প্রথম-প্রথম।

অতএব আমাকেও সে-অভিনয়ে তাল দিতে হলো। মুগ্ধ পুরুষের ভূমিকা নিলাম, নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত প্রেম-বিহ্বল মুগ্ধ এক পুরুষ।

কিন্তু সবটাই কি অভিনয় হতো?

সদ্য যৌবনবতী সুন্দরী এক মেয়ে, যে-মেয়ে আইনত একান্তই আমার, তার সর্বদা সান্নিধ্য কোনো পুরুষকে মুগ্ধ বিহ্বল করে তোলার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়? বাড়িতে তো আর কেউ নেই, শুধু আমি আর মিলি।... আর অভিনয়ে তার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটি কী মনোরম।

মাঝে-মাঝেই মনে হতো আর বোধহয় অভিনয় নয়, এটা সত্যিই। হয়তো মিলি তার কৈশোর প্রেমের রঙিন আবেগ থেকে মুক্ত হচ্ছে, প্রেয় আর শ্রেয়র মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছে, আর সেই শ্রেয়র মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান খুঁজছে।...এই ভাবনার স্বপ্নে মাঝে-মাঝে সত্যিই বিহ্বল হয়ে পড়তাম, অন্তরঙ্গতায় গভীর হতে চাইতাম, ভুলে যেতাম মিলির উপর অন্য আর কারো প্রভাব আছে।

কি জানি হয়তো বা মিলির মধ্যেও কখনো-কখনো আমার সেই স্বপ্নের ছায়া পড়ত, মিলিকে সত্যিই কাছের মানুষ মনে হতো।

মিলি ঘরবাড়ি সাজানোয় মন-প্রাণ ঢালত, সেই বাবদ এটা চাই ওটা চাই বলে আবদার করত, নতুন-নতুন রান্না শেখবার জন্যে রান্নার বইয়ের ফরমাশ করত, আর সেই রান্না রেঁধে আমাকে খাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করত।

কতকগুলো দিন বড় সুখে কাটত, মনে হতো রাহুমুক্ত জীবন পেলাম তাহলে।

কিন্তু কোথায় কী ঘটে যেত, আবার অন্যরকম হয়ে যেত মিলি, পদে-পদে ছন্দপতন ঘটত।

মিলি তখন কখনো বা নিষ্প্রাণ, কখনো বা অসহিষ্ণু। কখনো বা অতি অভিনয়ে উৎসাহী কখনো বা উন্মনা অস্থির···লক্ষ্য করতে লাগলাম জলপাইগুড়ির চিঠি মিলির এই স্বস্তি-শান্তি-স্থিবতার অপহারক। এমনিতে ওর বাবার লেখা পোস্টকার্ড প্রায়শই আসত, তার মধ্যে কুশল প্রশ্নের বিনিময় ব্যতীত আর বড় কিছু থাকত না, কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ এসে পডত এক-একখানা মোটা ভারি খাম, সেটাই হতো কাল।

চালাকি ছিল বৈ-কি, ওই খামের মধ্যে ওর বাবার চিঠিও থাকত একটুকরো এবং সেটা যে চতুব বিক্রম রায়ই ম্যানেজ করত তাতে সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব বলত, 'মিলিকে চিঠি দেবেন না-কি মামা? দেন তো আমিও একটু লিখব।···বিয়ে হয়ে গিয়ে আমাদের একদম ভুলেটুলেই গেল না-কি দেখি খোঁজ নিয়ে।'

হ্যাঁ এই ধরনেরই কথা ওর।

স্বভাবতই ব্রজেন চ্যাটার্জি এ-ফাঁদে পা দেন, এবং নিজের চিঠিটা বিক্রমের হাতে দিয়ে পোস্ট করবার দায় থেকে নিশ্চিন্ত হন।

সব চিঠি আমার গোচরে আসবার কথা নয়, পিয়ন যখন আসে, আমি তখন নেই। তবু দৈবাৎ এক-এক সময় তেমন যোগাযোগ ঘটেও যেত।

তেমন ক্ষেত্রে—মিলি আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে স্বগতোক্তি করত—কী হলো। বাবার এত ভারিসারি চিঠি কেন?···

তারপর আবার উচ্চস্বর স্বগতোক্তি, এ-মা, বিক্রমদাও আবার এর মধ্যে একখানা চিঠি পুরে দিয়েছে! তারপর চিঠিখানা হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে-বোলাতে বলে উঠত—বাবাঃ এত আবোল-তাবোল কথাও লিখতে পারে! কিনা—কোন্ গাছটায় ফল ধরেছে, কোন্ গাছটায় ফুল ফুটছে, কোন্ গরুটার বাছুর হয়েছে। পাড়া রাজ্যির কার বাড়িতে কী-কী ঘটনা ঘটেছে উঃ।...যেমন বাচ্চাদের মতন হাতের লেখা তেমনি বাচ্চাদের মতন চিঠির বিষয়বস্তু।

জানে আমি ওর চিঠি টেনে নিয়ে পড়ব না, তাই এভাবে চালিয়ে যেত।

কিন্তু চেষ্টাকৃত স্বাভাবিকতা কতক্ষণ টেঁকে?

দেখা দিত বৈলক্ষণ। প্রায় বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া মিলির মধ্যে ফুটে উঠত এক ধরনের বন্যতা।

বারে-বারে এ-বকম ঘটতে-ঘটতে হঠাৎ একদিন এক টেলিগ্রাম এল ব্রজেন চ্যাটার্জির স্ট্রোক।

তদ্দণ্ডে মিলিকে নিয়ে ছুটলাম, আর দেখলাম জলজ্যান্ত টগবগে একটা লোকের এক মুহূর্তে কী পরিণতি ঘটতে পারে।...

কয়েকটা দিন থেকে আমাকে চলে আসতেই হলো, মিলি রয়ে গেল আরো কিছুদিনের জন্যে।

অর্থাৎ শুধু ব্রজেন চ্যাটার্জিই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে রইলেন তা নয়, আমার জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও পক্ষাঘাত ঘটল।...মিলি ফিরে এল যেন ভূতগ্রস্তের মূর্তি নিয়ে।...মিলির মধ্যে আর সেই অভিনয়ের সাধনা নেই, নেই সেই মানিয়ে নেবার চেষ্টা। মিলি যেন অন্য এক গ্রহের প্রাণী হয়ে গেছে।

ব্রজেন চ্যাটার্জির ব্যাধিটা কি সত্যিই ভাগ্যের মার? না-কি কোনো কুটিল চক্রান্তের ফল। সন্দেহটা মনের মধ্যে ছায়া ফেলে-ফেলে যায়। এই অসভ্য চিন্তাটা হয়তো আমারই মনের পাপ।

আচ্ছা, আমার কি তখন কঠোর হওয়াই উচিত ছিল? আমার কি ওর এই ভাবান্তরের কারণকে উদ্ঘাটিত করে ফেলে শক্ত হাতে

হাল ধরাই সঙ্গত ছিল? কি জানি তাই করলেই ভাল হতো কি-না। ওর এবং আমার দুজনেরই ভাল।

কিন্তু আমি তা করিনি, আমি ভীষণভাবে ইনোসেণ্ট সেজেছি, আর বাপের জন্যে ভেবে-ভেবে মিলি শরীর খারাপ করে ফেলেছে বলে ডাক্তার ডেকেছি।...সেই ডাক্তারের সূত্রেই পলির জন্মের সম্ভাবনা ধরা পড়ল।

অতএব মিলির এখন সাতখুন মাপ।

ডাক্তারের মতে, প্রথমবার এমন অবস্থায় অনেক মেয়ের অনেক উল্টো-পাল্টা মতিবুদ্ধি হয়, কত মেয়ের মধ্যে পাগলামিই দেখা দেয়। স্নেহ আর সহানুভূতির সঙ্গে ওর সবকিছু অসঙ্গতি মেনে নিতে হবে।...

বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই, একজন মহিলার প্রয়োজন বলে আমার এক দূর সম্পর্কের মাসিকে আনতে চাইলাম। মিলির প্রবল আপত্তিতে সে চেষ্টা সফল হলো না।...মিলি ঘোষণা করে বলল, মরি মরব, বাঁচি বাঁচব, কারো তদারকি সইতে পারব না? কেন, মাইনে দিলে লোক মেলে না জগতে?

তদবধি মাইনে-করা লোকেরই আমদানি ঘটতে লাগল বাড়িতে, একটির-পর-একটি। শিশুর আবির্ভাব ঘটলে আরো পাঁচ ছ'টা লোক না হলে যে সংসার চালান যায় কী করে, এটা নাকি মিলির ধারণার বাইরে। তা ভাগ্যও মিলির সহায়। কর্মক্ষেত্রে আমিও ক্রমশই সিঁড়ির-পর-সিঁড়ি বেয়ে চূড়োর দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি।...

লোকে আমার স্ত্রী ভাগ্যের জয়জয়কার করছে, এবেলা-ওবেলা রং বদল হচ্ছে আমার জীবনযাত্রা পদ্ধতির। শিশুর জন্যে আয়োজনের সীমা নেই, সমারোহের শেষ নেই। যেন নেশাগ্রস্তের মতো কোন একটা অজানা পথের দিকে এগিয়ে চলেছে মিলি। কোনো এক জায়গার শূন্যতা পূরণ করতে বস্তুর স্তূপ জমিয়ে তোলার নেশায় মাতে মিলি। নেশা নেশা!

নেশার তাড়নাতেই দিকভ্রান্তের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে মিলি নামের মেয়েটা। ছুটতে-ছুটতে বয়েস পার করে ফেলেছে এবং অবশেষে সত্যিকার স্থূল নেশায় আসক্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংস করছে।

কবে থেকে যে ড্রিঙ্ক করতে ধরেছে মিলি আমিও জানি না।···কি জানি, সেটা জলপাইগুড়িব অবদান কিনা। অথবা আমারই বন্ধু-বান্ধবদের অবদান। ক্রমশই যাঁদের সঙ্গে আমার আদর-আপ্যায়নের আদান-প্রদান হতে থাকল তাঁদের সকলেই তো প্রায় ওই গুণে গুণমণি। তাঁদেব প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনীরাও অনেকেই প্রায় তাই।

কর্মক্ষেত্রে যত টপ্-এ ওঠা যায়, মর্মক্ষেত্রে যে ততই পাতালে নেমে পড়তে হয় এ তো প্রায় অবধারিত।

মিলি সেই টপ্-এ ওঠার চেহারাটা পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলতে লাগল, মিলি সর্বদা ওদের উপর টেক্কা দেওয়ার চেষ্টায় প্রাণপাত করতে লাগল।···মিলি আধুনিকতার একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা করে নিয়ে, জীবনকে বিকৃতছাঁচে ঢালাই করে ফেলতে লাগল।

কে জানে কে কখন ওর কানে মন্ত্র দিয়ে বসেছিল রাত্রে বাচ্চাকে কাছে রাখা গ্রাম্যতা, পলি বেচারি সে-মন্ত্রের বলি হলো। অতি শৈশবেই আমাদের শোবার ঘর থেকে নির্বাসন ঘটল পলির।

পলির নির্বাসনের সেই প্রথম রাতটা কী দুঃখময়।

পলির কতখানি কষ্ট হয়েছিল জানি না, আমার নিজের কাছে আজও সেটা একটা শোকের ঘটনার মতো বেদনা-জর্জর-স্মৃতি।

ঘরে এসে পলির 'রেলিং দেওয়া ছোট্ট খাটটি দেখতে না পেয়ে চমকে উঠে বললাম, 'পলি ?'

মিলি সংক্ষেপে বলল, 'ও-ঘরে।'

ও-ঘরে ? তার মানে ?

মানে আবার কী ? এখন থেকে ও ওই ঘরেই শোবে।

পলি ও-ঘরে শোবে ? কেন ? কী হয়েছে পলির ?

মিলি বিরক্ত গলায় বলল, হবে আবার কী? ন্যাকামি কোর না বেশি। বড় হয়ে ওঠার আগে বাচ্চাদের আলাদা রাখাই উচিত।

আমি খাটে বসে পড়লাম।

আমার মনে হলো, সেই ছোট্ট খাটটুকুর জায়গার শূন্যতা যেন আমার সমস্ত পৃথিবীকে হঠাৎ শূন্য করে দিয়েছে।

গভীর গাঢ় গলায় বললাম, মিলি কাল রাত্তির পর্যন্তও পলি ছোট্ট ছিল, একদিনের মধ্যেই এমন কি বড় হয়ে গেল?

মিলিরও নিশ্চয়ই মন কেমন করছিল, তাই মিলি আরো রুক্ষ হলো, বলে উঠল, যে-কোনোদিনই এই প্রশ্নটা থাকবে।...ডিসিশান নিতে হলে কোনো একদিনই নিতে হবে।

তবু আর কিছুদিন ও আমাদের কাছে থাকতে পারত। বড় হয়ে উঠতে ওর অনেক দেরি!

মিলি বালিশে মাথা ফেলে দেওয়ালমুখো হয়ে শুয়ে তিক্তবিরক্ত একটা গলায় উত্তর দিল, এরকম বোকার মতো কথা তোমার পক্ষে সম্ভব। বাচ্চার অনুভূতির তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান আছে।

'বোকার মতো কথা' বলার অপবাদটা মিলির কাছে আমার অহরহের প্রাপ্য। ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাই আরো বোকার মতো বলে ফেলি; আমার বড্ড মন কেমন করছে মিলি...

মিলি উঠে বসল, বলল, বেশ নিয়ে আসছি। তবে রাত্রে ওকে দেখাশোনা করার দায়িত্বটা নিতে পারবে তো?

আমি আরো বোকা হলাম।

কারণ আমি যেন মিলির চোখটা ফুলো-ফুলো দেখলাম, তাই বলে উঠলাম, কেন পারব না? খুব পারব। দেখ তোমায় একবারও উঠতে হবে না—তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিও।

মিলি স্থির পাথুরে গলায় বলল, আমার নিশ্চিন্ততার অভাবের প্রশ্ন নেই, আমি তো ও-ঘরে শোব।

মিলি বালিশটা হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়াল।

অতএব আমি ভয় পেলাম।

এই ভয় পাওয়ার জন্যে নিজেকে আমি সতত 'অপদার্থ পুরুষ' বলে গাল দিয়েছি। তবু সেদিন আমি ভীত হয়ে ওর হাত চেপে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, কী যে পাগলামি কর।···আচমকা একটা ব্যবস্থা করে বসলে, আগে থেকে জানলাম না—

মিলি ব্যঙ্গের গলায় বলল, ওঃ! প্রতিটি তুচ্ছ ব্যবস্থাতেও তোমার অনুমতি নেওয়া দরকার তা জানা ছিল না! বেশ তো—নিয়ে আসছি ওকে। তবে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা চুকোতে হবে।··· তোমাদের আমলেব মতো অসভ্যতা আমাব দ্বাবা হবে না।··· কতজন ভাইবোন যেন তোমরা মা-বাপের সঙ্গে এক-ঘরে শুতে? চার? পাঁচ? না কি আরো বেশি? হি হি হি!

অপদার্থ!

সত্যিই অপদার্থ!

তাই আমি ওর গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে না গিয়ে, লজ্জায় মাথা হেঁট কবে নিঃশব্দে খাটের একধারে শুয়ে পড়লাম।···

আমি অপদার্থ, আমি কাপুরুষ, আমি অশান্তির ভয়ে, সর্বাধিক অন্যায় মেনে নিই, মেনে নিই বহুবিধ অপমান।···মিলি এই সুযোগটা পেয়ে যায়, মিলি কোনোদিন জানেনি 'বাধা পাওয়া' বলে একটা জিনিস আছে সংসারে।···নাঃ মিলির বিচরণের মাঠের কোনোদিকে কোনো বেড়া নেই।···

কিন্তু বেড়া থাকলেই কি মিলি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসত? মিলি সে-বেড়া ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করত না?

রায়চৌধুরী বলে, 'কলসীর মধ্যে থেকে দৈত্যকে বেরোতে দিলে আর তাকে কলসীর মধ্যে ঢোকানো যায় না, বুঝলে মুখার্জি? যেন সব গল্পই নীতি-গল্প। কিন্তু সে-রহস্য বোঝে কে? আমরা সেই কলসী থেকে দৈত্য বার করে ফেলা বোকা। এখন দৈত্যকে কাঁধে চাপিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি।'···

বাজারে 'স্ত্রৈণ' বলে আমার বিশেষ একটা সুনাম আছে, তাই আমাকেই মাঝে-মাঝে জ্ঞান দেয় রায়চৌধুরী। এই সুনামটি অর্জন করতে আমায় কত খেসারৎ দিতে হয়েছে, মিলি কি জানে সে-কথা? জানাতে গেলে জানতে চাইবে?

লোকচক্ষু থেকে আমার ছেঁড়া জামার ফুটো আড়াল করতে অহরহ চাদর চাপিয়ে বেড়াচ্ছি আমি। কানের কাটা ঘা চুল দিয়ে ঢাকছি।···আমার জীবনের ফাঁকির ফাঁকটা চাপা দেবার সাধনায় সাধনায় মিলির থেকেও উচ্চমানের অভিনেতা হয়ে গেছি, আমার নিজস্ব গড়নটা আজ আর নিজেই খুঁজে পাই না যেন।

অশান্তির ভয়ে আমি পদার্থ হারিয়ে 'অপদার্থ', পৌরুষ হারিয়ে 'কাপুরুষ', তবু অশান্তিকে কি এড়াতে পারলাম?···দিনে-দিনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে মিলি, উদ্ধত দুর্বিনীত স্বেচ্ছাচারী।···সারাদিন মিলি প্রগতির আগায়-আগায় এগিয়ে যাবার চেষ্টায় কী-না করে বেড়ায়! কে-যে ওকে নিত্য নতুন 'ডিজাইন' যোগায় সেই প্রগতির, ভগবান জানেন। তবে দিনের শেষে সেই ডিজাইনটা চমকপ্রদ হয়ে ওঠে।···মিনি বোতলের শরণ নেয়।

আর গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে তার জের।

মিলি চেঁচায় গাল পাড়ে, ভাঙেচোরে, দাপাদাপি করে, আবার কখনো-বা লুটিয়ে-লুটিয়ে কাঁদে।···

তবে?

কী করে আমি ওর উপর রাগ করবো।

ওর অসহায়তা দেখলে আমার ভীষণ মায়া হয়।

আচ্ছা ও যদি আমার কাছে সত্যিই 'অনাঘ্রাত কুসুম' হয়ে এসে দেখা দিত, শুধুমাত্র প্রগতির শিকার হয়ে কি এমন বিকৃত হয়ে উঠত? মদ খেয়ে লুটোপুটি করত?

ভাবলে অবাক লাগে—একদা আমাদের বাড়িতে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নিত্য তাঁর পূজারতি হতো।

আচ্ছা আমি যদি আমার বাবার মতো সামান্য মাইনের কেরানী হতাম।

মিলি তো তাহলে নিজেকে ধ্বংস করবার এমন জোরালো হাতিয়ার হাতে পেত না। মিলিকে ধ্বংস হতে আমিই হয়তো সাহায্য করেছি।

মা বলতেন, লক্ষ্মী যতক্ষণ 'মাপা-অন্নে'র রূপে ততক্ষণই তিনি 'লক্ষ্মী'। আর যখনই তিনি 'আমাপা অতিরিক্ত'র রূপে তখনই তিনি 'অলক্ষ্মী'।...অতিরিক্তই মানুষকে অতি-'রিক্ত' করে তোলে।

বাবা হাসতেন, বলতেন, শোন্ শোন্ তোদের দার্শনিক মায়ের তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা শোন্।

বাবা ছিলেন যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি।...

আর কী আশ্চর্য মধুব সম্পর্ক ছিল ওঁদের দু-জনের মধ্যে।

মা কিছু বললেই বাবা আমাদের ডেকে-ডেকে বলতেন, শোন্ শোন্ তোদের জননীর কথা শোন্—

আবার বাবা কিছু বললেও মা আমাদের ডেকে বলতেন, শুনছিস? তোদের বাড়ির বড়সাহেবের কথা শুনছিস।...

হয়ত সামান্যই কথা, তবু একে অপরের কথার মধ্যে যে মাধুর্যের স্বাদ পেতেন, তা ছেলেমেয়েদের না-শুনিয়ে পারতেন না। আমারও তাঁদের আনন্দরসের ভাগীদার।..

আমি ফেলিওর।

আমি আমার জীবনে আনন্দের রসের সন্ধান পাইনি। আহরণ করবার পদ্ধতি শিখিনি।

বাবাই ছিলেন গৃহদেবতার নিত্য পূজারতির পূজারী।

কী অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবা তাঁর সেই কর্তব্যকর্মের ভারটি বহন করে চলতেন, কী অসীম নিষ্ঠায় মা সেই কাজটির গোছ করে দিতেন।...মা যখন ঠাকুরঘরের কাজ সেরে নেমে আসতেন, আমাদের ছুঁতেন, মার আঙুলের ডগায় থাকত চন্দনের গন্ধ,

মার ভিজে চুলের খাঁজে-খাঁজে ধূপের সৌরভ।…মাকে যেন ঠাকুর মনে হতো আমাদের।

সমস্ত দিন কী অক্লেশে মা কত ক্লেশকর কাজই করে চলতেন। আমাদের ঘুমভাঙার আগে থেকে আমাদের ঘুমিয়ে পড়ার পরে পর্যন্ত। সব কাজের হিসেবই জানা ছিল না আমাদের।

তবু প্রসন্নতাই ছিল তাঁর ইষ্ট দেবতা।

সে-প্রসন্নতার ছাপ আমাদের মধ্যেও ছিল বৈ-কি।

ভাবলে অবাক লাগে আমার দিদিদের সাজসজ্জার উপকরণ ছিল কত সীমিত। আমারও স্কুলে যাবার জুতোয় দু-তিনবার তালি পড়ার পর তবে নতুন জুতো কেনার প্রশ্ন উঠত।…পেন্সিলের মাপ আধ ইঞ্চিতে না-পৌঁছন পর্যন্ত, নতুন পেন্সিলের কথা ভাবতাম না আমরা, স্কুল-জীবনে 'পেন্'-এর স্বপ্নও দেখিনি।…

আরো কত কী-ই অভাব ছিল আমাদের।

কিন্তু সত্যি কি 'অভাব' ছিল? মনের মধ্যে তো ছিল না সেই অভাববোধ।

পলির কাছে আমার ছেলেবেলার গল্প করতে গেলে পলি ওর মায়ের মতোই ঘৃণায় ধিক্কারে সেখান থেকে উঠে যায়।…এরকম লজ্জার কথা শুনলে না-কি তার মাথা ধরে ওঠে। গা বমিবমি করে।

উঠে যাবার সময় বলে যায়, কী পুয়োর! কী পুয়োর।

কিন্তু সত্যিই কী আমরা খুব গরিব ছিলাম?

পলি খুব সুখী?

পলি আর তার মায়ের মতো দুঃখী আমি তো আর দেখি না।

মাঝে-মাঝে মনে হয় মিলিকে হয়ত আমার ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল। মনহীন একটা শরীরকে আটকে রেখে অবসন্ন-করা সংসার করা খেলার চেষ্টায় ওকে বিকৃত করে ফেলেছি।…

এ-খেলার মানেই বা কী?… শুধু লোকের সামনে মুখ রাখা।

কিন্তু মিলিকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না আমার।

মিলি আমার যন্ত্রনা, তবু মিলি আমার সুখ।

মিলি চলে গেলে ভয়ানক মন কেমন করে আমার, ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।···তাই বারে-বারেই ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে, ওর অনুপস্থিতিতে সংসারের দুরবস্থার ছবি দেখিয়ে ওকে ওর মূল্য বুঝিয়ে দেওয়ার ফাঁদে ফেলে ফিরিয়ে-ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

এটা হয়তো আমার স্বার্থপরতাই।

অদ্ভুত একটা জোড়াতালির জীবন আমার।

কিন্তু মিলিকে তার সেই প্রেমাস্পদের হাতে ছেড়ে দিলেই কি মিলি সত্যি সুখী হতো?···ওই রায় লোকটা যদি অধিকারের মাটিতে দাঁড়িয়ে ওকে করতলগত করতে চাইত, মিলির মতো জেদী একগুঁয়ে 'অ-বাধ্য' মেয়ে কি নির্বিবাদে ওই চাওয়াটা মেনে নিত?

না-চাইলে?

না-চাইলে কি শ্রীবিক্রম রায়ের এই মূর্তিটি থাকত? যে-মূর্তির দুর্বার আকর্ষণে মিলি কোনদিন একটা সুস্থ জীবনের কেন্দ্রে স্থির হতে পেল না। কে জানে অত্যাচারীই হতো কিনা! ওকে ঠিক বোঝা যায় না। তবু লোকটাকে আমি প্রশংসাই করি। অথবা এক ধরনের শ্রদ্ধা।···ওর ভালবাসার জাত যাইহোক যেমনই হোক ওর প্রকৃতি, ও-তো আপন নিষ্ঠায় স্থির আছে।···ও-তো জীবনটাকে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে।···ওর হাতে দিব্যি একখানা রাজ্যপাট, অনায়াসেই ও কোন একখানি মহারানী যোগাড় করে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারত। কিন্তু ও তা করতে পারেনি।

ওরও তো 'মিলি' নামের মেয়েটা 'সুখ' নয় 'যন্ত্রনা।'

যন্ত্রনারও বোধকরি একটা নেশা আছে, যে যন্ত্রনা অহরহ চাবুক মারে অনুক্ষণ কুরে-কুরে খায়, যখন-তখন আগুনের ছ্যাঁকা দেয়।

মিলির আর আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা তো ক্রমশঃ এই রাক্ষুসে যন্ত্রনাটাই।

তবু মিলির গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পৃথিবী ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

অন্যবার ঠিক এরকম হয় না।

অন্যবার চলে যাবার মধ্যেও ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে।···আমি যখন ঠিক গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে গাড়ির জানলা দিয়ে ওর কোলের উপর নোটের গোছা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলি, এখন এটা রাখ, পরে দরকার হলে আবার—

তখন ও জানলা দিয়ে একবার মুখটা বাড়ায়। ওর চোখের তারায় একটা ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে, ও জানলার মধ্যে থেকেই হাতটা নাড়ে।

তার মানে ওর পাথুরে স্থিরতায় হঠাৎ একটু ফাটল ধরে।···কিন্তু এবার আর আমি সে-সুযোগ পাইনি।

মিলি গাড়িতে ওঠবার আগেই জানলার কাঁচ বন্ধ করিয়ে রাখিয়েছিল। মিলি একেবারে পিছনে পিঠ ঠেসিয়ে বসেছিল।

বুঝতে পারছি মিলি আর আসবে না।

সর্বক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করেও মিলি এতদিন এরকম ভেঙে পড়েনি, এবার মিলি ভেঙে পড়েছে।···পলি তাকে ভেঙে দিয়েছে।

যতদিন পলি মায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে তৎপর থাকত, ততদিনও মিলি অটুট ছিল। পলি যখন তার সদ্য যৌবনের দুঃসাহসে আশৈশবের সমস্ত অত্যাচারের শোধ নিতে চেষ্টা করত, আবাল্যের চাপা বিদ্রোহকে প্রকাশ করত, তখন পলির অস্ত্র ছিল—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মুখোমুখি জবাব।···

সে-অস্ত্রের কাছে হার মানত না মিলি, আপন আয়ুধ থেকে আমদানি করত আরো জোরালো-জোরালো অস্ত্র।

পলি অবশ্য ব্রহ্মাস্ত্রও বার করত যখন-তখন। সেটা হচ্ছে বাইরের লোকের সামনে আমাদের বিশেষ করে মাকে অপদস্থ করা। সে-অস্ত্রের প্রহার বড় কম সাংঘাতিক নয়। তাকে ঠেকাতে প্রচণ্ড শক্তি খরচ করতে হতো। সেটা হচ্ছে ওর সব ব্যবহারই অমৃতং বালভাষিতং হিসেবে ধরে নেওয়ার অভিনয় করা।

কিন্তু এখন পলি সে-সব ত্যাগ করে শেষ মারণাস্ত্র ধরেছিল। পলি বুঝিয়ে ছাড়ছিল—মাকে সে ঘৃণা করে। নিদারুণ ঘৃণা।···

সন্তানের ঘৃণার মতো অসহনীয় যন্ত্রনাদায়ক আর কী আছে?

মিলি অবশ্য 'নয়নতারা'র প্রসঙ্গ তুলে আমায় ধিক্কার দিয়ে চলে গেল। কিন্তু নয়নতারাকে পাঠান মনিঅর্ডারের রসিদ কি মিলি সবে নতুন দেখল?...বহু সতর্কতা সত্ত্বেও কবেই তো মিলি সেটা আবিষ্কার করেছে।...একবার নয়, একাধিকবার।

এই আবিষ্কার মিলিকে ভেঙে তো ফেলেইনি, বরং যেন অন্য একদিকে বল জুগিয়েছিল।...তার অবচেতনে যে একটা অপরাধবোধ মাঝে-মাঝে ভিতরে-ভিতরে দুর্বল করে ফেলত তাকে, সেই বোধটা যেন নয়নতারা প্রসঙ্গে নিজের অলক্ষ্যে একটা পৃষ্ঠবল পেয়েছিল।

যে-লোক চিরদিন যাবৎ লুকিয়ে একটা অজানা অচেনা ঠিকানায় একটা-মেয়ে মানুষের নামে মাসে-মাসে বেশ-কিছু টাকার মনিঅর্ডার পাঠায় এবং কেটে ফেললেও কিছুতেই বলে না কে সেই 'নয়নতারা দেবী' সে-লোকের কাছে আবার সততার দায় কিসের?

নয়নতারার কথা উল্লেখ করে-করে সে আমায়—যথেচ্ছ কটু-কাটব্য করবার সুযোগ পায়, যখন-তখন চরিত্রহীনতার অপবাদ দিয়ে আমাকে ধিক্কার দেবার অধিকার পায়। কাজেই নয়নতারা ওর 'জ্বালা' নয়, হয়ত গুপ্ত একটা অবিশ্বাস্য সন্দেহ। নয়নতারা ওর কাছে শুধু অন্ধকারের যবনিকা।

তবু চলে যাবার আগে ও সেইটাকেই বড় করে তুলে ধরল।

জোরে জোরে পলিকে শুনিয়ে-শুনিয়েই বলল, বলবে না তাহলে নয়নতারা কে?

আমি বললাম, অনেকদিন আগেও তুমি এ-প্রশ্ন করেছিলে; সেদিনও যা উত্তর দিয়েছিলাম আজও তাই দিচ্ছি প্রত্যেকেরই একেবারে ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপার থাকে, যার সম্মান রাখতে হয়। সেখানে অপরের চোখ ফেলবার চেষ্টা করতে নেই।

ওঃ! ব্যক্তিগত ব্যাপার। চোর ডাকাত বদমাইশ গুণ্ডাদেরও

তো তাদের দুষ্কর্মগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেদিকে চোখ ফেলা চলবে না তাহলে?

সবকিছুকেই একই চালুনিতে ফেলে চালা যায় না মিলি।

কথার প্যাঁচেও সবকিছুকে চাপা দেওয়া যায় না। তুমি বলবে কি-না কে নয়নতারা? কেন তাকে মাস মাস এতগুলো করে টাকা পাঠান হয়?

এই পাঠানয় তোমার সংসারে কি কোনো অভাব ঘটেছে?

থাম। কথা দিয়ে সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা করো না। প্রশ্নটা অভাবের নয়, প্রশ্ন তোমার স্বভাবের। ব্যাপারটা যে দয়াদাক্ষিণ্যের নয় তা শিশুতেও বুঝতে পারে। দয়াদাক্ষিণ্যে নিশ্চয়ই লুকোচুরির দরকার হয় না। আমি জানতে চাই এই লুকোচুরিটা কেন?···

আমি কঠিন হলাম, বললাম, সব কথা তোমায় বলতেই হবে, এমন বণ্ড সই করে রাখিনি আমি। তোমার সব কথা আমি জানতে চাই?

মিলি যখন যুক্তিতে হারে, তখন গলার জোরকে সহায় বলে ধরে যখন অপ্রতিভ হয়ে পড়বার উপক্রম হয় তখন তীব্রতা দিয়ে সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

মিলি এখন অপ্রতিভ—মিলি অতএব তীব্র তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ মিলি প্রশ্ন করে, তার জীবনে এমন কি দেখেছি আমি যার মধ্যে লুকোচুরি আছে?

বলে উঠতে ইচ্ছে হলো, সব, সব মিলি সমস্ত। তোমার সবটাই তো মিথ্যের রাঙন বাংতায় মোড়া।

ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু বললাম না।

বলে লাভ কি?

মুখের উপর উচিত উত্তর পেলেই ওর চৈতন্য হবে? ওর লজ্জা হবে?···কেউই কি তা হয়? এ-জীবনে তো দেখিনি কখনো স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিলে কেউ লজ্জিত হয়েছে। ফল শুধু বন্ধুবিচ্ছেদ।

মিলির সঙ্গে আমি অবশ্যই কথার লড়াইয়ে নামি, কিন্তু কদাচ মারণাস্ত্র বার করি না। তার শেষ ফল আমার পরাজিত মূর্তি। এখনো তাই হলো, আমি সামলে নিয়ে বললাম, না হয় নেই, কিন্তু থাকলেও আমি সেদিকে উঁকি দিতে যেতাম না। ইগ্‌নোর করতাম।

মিলি ভুরু কুঁচকে বলল, ইগ্‌নোর ? ওঃ। স্বামী যদি—লুকিয়ে নিয়মিত কোনো স্ত্রীলোককে টাকা পাঠায়, স্ত্রী সেটা জানতে পেরেও ইগ্‌নোর করছে, এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পার ?

দেখাতে পারি এমন ধারণা আমার নেই, আমার নিজের কথাই বলছি।

মিলি হাঁপাচ্ছিল তাই বসে পড়ল।

তারপর বলল, নিজেকে উচ্চস্তরের লোক বলে প্রমাণ করতে চাইলেই এরকম বড়-বড় কথা সাজাতে হয়।···আমার শেষ-কথা—তুমি বলবে কি বলবে না।

জবাব দিলাম, তাহলে বলতেই হয় বলব না।

আচ্ছা ঠিক আছে।

মিলি সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, পলি, শুনলে তোমার বাবার জবাব।

পলি এই হল-এরই একদিকে জানলামুখো হয়ে দাঁড়িয়ে গুণ-গুণ করে একটা সস্তা সুরের হিন্দিগান গাইছিল, ডাক শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে ব্যঙ্গের গলায় বলল, আমি আপনাদের কোন কথাই শুনিনি ম্যাডাম। শুনতে পাইনি।

শোনোনি ? আচ্ছা এখন শোনো, তোমার সাধুসন্ত বাবা নয়নতারা নামের কোন এক স্ত্রীলোককে—

পলি শুনল না।

পলি একটা পাক খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু চলে যাবার সময় বলে গেল, মাপ করুন মিস্টার এণ্ড মিসেস, আপনাদের কারো কথাই শুনতে আমার রুচি নেই। দু-জনকেই সমান ঘেন্না করি।

বলল হ্যাঁ। এই কথাটাই স্পষ্ট গলায় বলল।

বলে নাচের ভঙ্গিতে পাক খেতে-খেতে চলে গেল।...এটা অবশ্য নতুন নয়, এইটাই ওর অগ্রাহ্য করবার ভঙ্গি।

মিলি, তুমি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? এ-ভঙ্গি তো তোমার কাছেই শেখা তোমার মেয়ের।...নাচের ছন্দ না হলেও একেবারে নস্যাৎ করে দেবার মতো বিশেষ-বিশেষ কিছু ভঙ্গি তো তোমারও দারুণভাবে আয়ত্ত।...

তোমার মেয়ে তোমার কাছ থেকে অন্য কিছু নেয়নি, গান নয়, সূঁচের কাজ নয় একশো উপকরণের প্রসাধন নয়, রান্না নয়, ঘর সাজানো নয়, নিয়েছে শুধু এই ভঙ্গিটি।...পলির ঘর যতদূর নয় অগোছাল, পলি রান্না তো দূরস্থান এক গ্লাস জল নিয়ে খেতে জানে না, পলির চুল থেকে নাক পর্যন্ত অপারিপাট্যের নিদর্শন একখানা বুনো বললেই হয়, ছুঁচটুচ্ ছেড়ে দাও, পলি তার সুন্দর সুরেলা গলাটা নিয়ে শুধু ভুল ভুল সস্তামার্কা হিন্দি গান গায়। শুধু তোমার ওই ভঙ্গিটি—অগ্রাহ্য করবার ভঙ্গিটি নির্ভুল তুলে নিয়েছে।...অতএব তোমারই অস্ত্রে তুমি নিহত হলে মিলি।

একটু পরে মিলি স্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল আমি কালই চলে যাচ্ছি, আর ফিরব না।

একথা অনেকবারই বলেছে মিলি, তবু মনে হলো যেন আজই প্রথম বলল। মিলির গলার সুরে নতুন একটা কিছু ছিল।

আমি কি ওর কাছে গিয়ে নয়নতারার কথা ব্যক্ত করে ফেলব? ভেবেছিলাম একথা। কিন্তু পারিনি। পারা অসম্ভব ছিল।...নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম মিলি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এখন চলে গেল।

কতক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি? এক ঘণ্টা? দু-ঘণ্টা? পাঁচ ঘণ্টা?

হঠাৎ খেয়াল হলো বাড়ির মধ্যে চলে আসা দরকার।...চলে এলাম। বাড়ির মধ্যে এখন আলোর ঘাটতি, বিকেল চলে গেছে, অথচ আলো হয়নি।...সিঁড়িটা আরো ছায়া-ছায়া।

সিঁড়ির মধ্যে এখনো মিলির চুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বলে !··· কোথাও বেরোবার আগে···কতরকম কী যেন মাখে মিলি, চুলে মুখে, গায়ে শাড়িতে।···বেরিয়ে যাবার পরও কতক্ষণ সেই বিচিত্র সৌরভের রেশ ঘরের বারান্দার সিঁড়ির বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে রাখে।

আজও রেখেছে।

হঠাৎ অনেক অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল।··· এমনি পড়ন্ত বেলার আবছা আলোর সময় আমার মাকে নিয়ে গিয়েছিল···নিয়ে যাবার পরক্ষণেই সেই ভয়ঙ্কর আলোড়িত বাড়িটায় হঠাৎ কী ভীষণ স্তব্ধতা নেমে এল।···যেন পৃথিবীতে কোথাও শব্দ নেই, সাড়া নেই, জীবন নেই। সমস্ত পৃথিবীটায় মৃত্যুর আধিপত্য;

আমি বিছানায় পড়ে আছি, আমার টাইফয়েড্।

আমার জন্যে বাবাকে যেতে দেওয়া হয়নি।

বাবাকে আমার রোগশয্যার পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বাবা বসে থাকেননি, বাবা যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো বিছানার ধার থেকে উঠে ঘরে বারান্দায় দালানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।···ঘরের মেঝেয় এখানে-সেখানে মৃতের খাট থেকে ঝরে-পড়া কিছু-কিছু ফুলের সৌরভ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার সঙ্গে ভাসছিল অগুরুর গন্ধ।

বুঝতে পারছিলাম বাবার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

কিন্তু কী পবিত্র সেই কষ্টটি।

মিলি, তুমি আমার জন্যে যদি তেমন একখানি পবিত্র কষ্ট দিয়ে যেতে পারতে। যে-কষ্টটি চিরদিন লালন করতাম গৌরবের সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে।

ছায়াচ্ছন্ন বাড়ির কোথায় যেন হঠাৎ কড়া আলো জ্বলে উঠল। আর আরো কড়া একটা শব্দ যেন এতক্ষণের স্তব্ধতার ওপর একটা চাবুক মারল—

হীরালাল চা কই ?

যেন একটা ধাতব বস্তু থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা।

এ-গলা কার? এতো রূঢ় রুক্ষ কর্কশ।
আমার মেয়ের!···কী আশ্চর্য!

মিলি

'নয়নতারা' কে এই কথা তুলে তুলকালাম করে চলে যাচ্ছি আমি কিন্তু সত্যিই কি আমার খুব মাথা-ব্যথা আছে নয়নতারা কে একথা জানতে।

হতে পারে নয়নতারা আমার পূজনীয় স্বামী শ্রীরঞ্জিত মুখার্জির কোনো পুরনো পাপ! পাপ আর সাপ এ-দুয়েরই তো জাত এক, ছোবল খেলেই মৃত্যু।···সাপ তবু সঙ্গে-সঙ্গেই খতম করে, পাপ বিষে জরজর করে রেখে—তিলে-তিলে ধ্বংসায়, অতএব জীবন-ভোর তার খেসারৎ দিয়ে চলে। সেই খেসারৎ দিয়ে চলেছেন রঞ্জিত সাহেব, নয়নতারা দেবীর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছেন মাসে-মাসে।

যদিও রঞ্জিত সাহেবের সঙ্গে ওই 'পাপ' শব্দটা ঠিক খাপ্ খাওয়ান শক্ত, তবু কি জানি মানুষের মন তো? মন থাকলেই মতিভ্রম।···প্রাক্-বিবাহ যুগের ব্যাপার থাকতে পারেও কিছু।

আবার দয়া-দাক্ষিণ্যও হতে পারে।

সেই মহৎ কাজটুকু আমার কাছ থেকে আড়াল করতে চায়। এরকম উল্টোপাল্টা' কিছু আছে ওর মধ্যে।

ওর মায়ের মৃত্যুদিনে সারাদিনটা কোথায় যেন গিয়ে বসে থাকে ওর সব কাজ বন্ধ রেখে অফিসে ছুটি নিয়ে, কে জানে বেলুড়ে না দক্ষিণেশ্বরে, ডায়মণ্ডহারবারে না ব্যাণ্ডেল চার্চে, কিছুতেই স্বীকার করে না সেটা।···প্রত্যেকবারই যাহোক একটা কিছু বানিয়ে বলে, অফিসের ব্যাপারের ছুতো করে, কিন্তু আমার কাছে কি আর চেপে রাখতে পেরেছে? আমি তো কবেই আবিষ্কার করে বসে আছি,

তবে আবিষ্কার যে করেছি, সেটা বলিনি। এমন অনেক কিছুই বলি না আমি জেনে-বুঝে।

রঞ্জিত যে তার বাবার নামে বছরে-বছরে কিছু দুঃস্থ ছাত্রকে বই দেয়, সেটাই কি আমি আজ জেনেছি? কবেই জানা হয়ে গেছে। তবে জেনেছি সেটা জানাব কেন? ও যখন বলে না। নিশ্চয় ও আমায় নিচু চক্ষে দেখে, তাই একান্ত গভীর কথাগুলো বলে না।... কী-ই বা বলে? অন্তরঙ্গ কোন কথা কী হয় আমাদের মধ্যে?...

আমরা আড্ডা দিই তর্ক করি, রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে চিন্তা-শীল মতবাদ প্রকাশ করি, কিন্তু কদাচ অন্তরঙ্গতায় পৌছয় না সেসব কথা।...কী করে পৌছবে? ওগুলো তো আর আমাদের সত্যিকার অন্তরের বস্তু নয়? আমরা ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে উঠেছি কখন?... তাছাড়া—বেশির ভাগ সময়ই তো ওই আড্ডাকালে বাইরের লোকের উপস্থিতির ভার। হয়ত বা ভারও নয়, ভার লাঘবেরই ভার নেয় ওরা।

যতক্ষণ বাইরের লোকের উপস্থিতি, ততক্ষণই তো আমরা দুটো সুখী উজ্জ্বল আহ্লাদে-ভাসা মানুষ। তারা বিদায় নিলেই তো আমরা গ্রীনরুমে। তখন মেক্‌আপ মোছার পালা। আর সেই মেক্‌আপ-মোছা দুটো লোক তো দুই শিবিরের লোক—দুই শত্রু শিবিরের!

কখন তবে অন্তরঙ্গ কথার চাষ হবে? অঙ্গটা একটা একবগ্‌গা জানোয়ার সে কখনো-কখনো নিজের গরজে মেলে, কিন্তু অন্তরের তো নিজের গরজ নেই। না ওর, না আমার।

জীবনটাই যখন এমন ফাঁপা, তখন বহিরঙ্গের জৌলুসটাই বাড়ুক। নইলে কিসের উপর ভর করে দাঁড়াব? কী নিয়ে মেতে থাকব? আমার জৌলুস দেখে লোকের তাক লাগে, সেটাও তো দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের একটা খাদ্য।

এইসব নিয়েই তো আমি রঞ্জিতকে হুকুম করতে পারি, ফরমাশ করতে পারি, কখনো বা আবদারও, রঞ্জিত যে আমার অধিকারের

একটা ক্ষেত্র, সেটা অনুভব করতে চেষ্টা করি এই বহিরঙ্গের রূপে পালিশ লাগাতে।

দুজনে মিলে যখন দোকানে-দোকানে অর্ডার দিয়ে বেড়াই, বেছে-বেছে শৌখিন জিনিস কিনি, তখন হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয় সত্যিই হয়ত আমরা একটা সুখী-দম্পতি।

কিন্তু সত্যি তো আর নয় তা? তাই 'নয়নতারা' আমার বুকে এসে বেঁধেনি। আব সত্যি বলতে ব্যাপারটা যে ভয়ানক একটা কিছু তা আমার মনেও হয়নি। তবু ওর ওই নিয়ে এই লুকোচুরিটা আমাব খুব কাজে লেগে গেছে, যখন-তখন সেটাকে কাজে লাগাতে পারি, উঠতে-বসতে ওকে কোপ্ দিতে পারি।

আজ সেটাকেই চরম কাজে লাগালাম।

আমার চলে যাওয়ার সপক্ষে 'নয়নতারা' প্রসঙ্গকে খাড়া করলাম।

কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি কেন?

চলে যেতে কি আমাব মন-প্রাণ ভেঙে যাচ্ছে না? খেলাচ্ছলেই হোক আর নিজেকে নিজে ভোলাতে আর ভুলিয়ে রাখতেই হোক এই সংসাবটাকে কি তিল-তিল করে গড়িনি আমি? এর প্রতিটি জায়গায় কি আমার যত্ন নেই, পরিশ্রম নেই?

রঞ্জিতের জন্যে কি আমার ভয়ানক মন কেমন করছে না? আর পলি? যে-পলি আমায় শেষ করে দিয়েছে আমায় গুঁড়ো করে ফেলেছে, আমাব দিন-বাত্রি জ্বলন্ত জ্বালায় ভবিয়ে তুলেছে, আমার সমগ্র পৃথিবীটা একই বিস্বাদ করে দিয়েছে? সেই পলিকে ছেড়ে চলে যেতে আমার সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে কেন?

পলিকে ফেলে-ফেলে তো কতবারই চলে গেছি, কতদিন থেকেই যাচ্ছি, যখন থেকেই ও আমার দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করেছে, আমাব আর বিক্রমের দিকে সন্দেহের চোরা চাহনি ফেলতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই তো ওকে ভয় করতে হয়েছে আমায়। তখন থেকেই ওকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে।

আমার ভাগ্য যে ছ-বছরের পলি হঠাৎ জগতের এই পরম পাকা দৃষ্টিটি লাভ করে বসে আছে।

অতএব সাবধান হতে হয়েছে আমায়, ওর ভালর জন্যেই হতে হয়েছে। ছোট্ট মন নরম মন, কী বুঝতে কী বুঝবে, কী দেখে কী ভেবে বসবে, সমুহ ক্ষতি হতে পারে তা থেকে, তাই ওর পড়ার ছুতো করেছি, স্কুল কামাইয়েব ছুতো করেছি, ওর জন্যেই ওর ওপর নিষ্ঠুর হয়েছি। এখন সেই নিষ্ঠুরতার সুদে-আসলে শোধ দিচ্ছে পলি। ছুঁচ ফোটানোর বদলা নিতে বিষবাণ মারছে, গালে টুসকির বদলায় মাথায় হাতুড়ি বসাচ্ছে।

আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি মরে যাচ্ছি।

তবে? চলে যাওয়া ছাড়া আর কী করব?

আমি পলির ওই ঘৃণার চোখের সামনে টিঁকে থাকতে পারব না।

কিন্তু সত্যিই কি আমি এত ঘৃণ্য? এত নোংরা নীচ?

আমি তো বারেবারেই নিজেকে সামলাতে চেয়েছি, একটি শুভ সুন্দর পরিশুদ্ধ জীবনের স্বপ্ন দেখেছি, নিজেকে সেই পরিশুদ্ধির পথে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ভাগ্য বারেবারেই আমার সে-চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, সে-স্বপ্নকে ধূসর করে দিয়েছে।

এবার মনকে ঠিক করে ফেলেছি, এবার আর পরিশুদ্ধির স্বপ্ন নয়, পরিসমাপ্তিই আসুক।

সেই পরিসমাপ্তি টেনে দেব নিজের হাতে।

আমার এই সংকল্প বাক্য শুনে অলক্ষ্যে হয়ত কেউ হাসছে, হয়ত বলছে, কী রে, এ-সংকল্প তোর আজ নতুন না-কি? সেই কোন্ কাল থেকে তুই মনে-মনে গলায় দেবার দড়ি পাকিয়ে আসছিস না? বিষ খাবার বিষ-বড়ি যোগাড় করতে তৎপর হচ্ছিস না? তুই গঙ্গার জল, বোতলের কেরোসিন, আর বাপের বন্দুকের বাক্সটা, এদের নিয়ে চিন্তা করে আসছিস না চিরটা কাল?

তা হাসুক এবার তাকে দেখিয়ে দেব। শেষবারের মতো একবার

বাবাকে দেখব। তারপর—শুধু যাবার আগে আমার জীবনের রাহুকে সব জানিয়ে যাব। সব লিখে রেখে যাব। সব—

হ্যাঁ তোমাকেই জানিয়ে যাব বিক্রম, না জানিয়ে মরতে পারব না। বিক্রম, এখন দেখতে পাচ্ছ তুমি আমার কী করেছ? কী ক্ষতি, কী অনিষ্ট। সারা জীবন তুমি আমার স্বস্তি কেড়ে নিয়েছ, স্থিতি কেড়ে নিয়েছ, আমার জীবনটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছ। জীবনে আমি একটা স্থির ভূমিতে শিকড গাড়তে পেলাম না। যখনি আপ্রাণ চেষ্টায় সে-চেষ্টা করেছি, তুমি তোমার প্রবল দাবির হাত বাড়িয়ে সেই সদ্য নামান শিকড়কে উপড়ে তুলে নিয়ে গেছ। অথচ তুমি ঠিক বসে আছ নিজের মাটিতে। তুমি এই এতো বছরের মধ্যে একবারও আমায় দেখতে আসনি।

বলতে পার আমারই বাবার জন্যে তুমি বন্দী, তবু বলব এ তোমার স্বেচ্ছা-বন্দীত্ব। তুমি দু-একদিনের জন্যে বিজনের ওপর রোগীর ভারটা দিয়ে আসতে পারতে না? বিজনও তো আমার জন্যে বাঁচতে পারে, মরতে পারে। আমি তাকে তাচ্ছিল্য করি, ব্যঙ্গ করি, উপেক্ষা করি, তবু সে অবিচল—আমি গেলে সে আর ও-বাড়ি থেকে নড়ে না, হ্যাংলা কুকুরের মতো বসে থাকে। মিলির বাবার ভার সে হাস্যমুখে নিত, যদি তুমি দিতে।

তুমি তা করবে না. যখনই তোমার আমাকে দেখবার ইচ্ছে হবে তখনই তুমি তোমার ইচ্ছে-শক্তিটাকে খাটিয়ে আমায় খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি মিছিমিছি টেলিগ্রাম করেছ বাবার অবস্থা খারাপ বলে, আমায় চিঠি লিখেছ তোমার অবস্থা বিশ্লেষণ করে-করে। তোমার সেই চিঠি আমায় পাগল করে তুলেছে, আমায় তিষ্ঠতে দেয়নি। আমাকে আমার সংসার-স্বামী-সন্তান সব ফেলে ছুটে চলে আসতে বাধ্য করেছে।

বিক্রম, তুমি আমার শনি, আমার রাহু। তুমি আমায় নিজেও নিলে না, অন্যকেও নিতে দিলে না। তুমি আবাল্য আমায় স্বপ্ন দেখিয়েছ আমার বাবার গোঁড়ামীকে নস্যাৎ করে দিয়ে তুমি আমায়

অধিকার করে নেবে। বরাবর বলেছ, 'দেখি কে তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে—'

অথচ বাবা যখন নিশ্চিন্তচিত্তে মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজছেন, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করছেন, তখন তুমি কথাটি বলছ না। তাব মানে বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে-প্রস্তাব করবার সাহস হয়নি তোমার। কারণ—কারণ তুমি জানতে আমার বাবা তোমার 'যৌবনে বিধবা' মায়ের প্রেমাস্পদ ছিলেন। তোমার মনের মধ্যে ভয়ানক একটা সন্দেহ ছিল, যা তোমায় মাঝে-মাঝে কাঁটা করে রাখত। তাই বিয়ের প্রস্তাব করতে তুমি সাহস পাওনি। ভয় হয়েছে যদি তার উত্তরে হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর সন্দেহের ছায়াটা অবয়ব নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

তোমার ওপর বাবার প্রবল ভালবাসাই হয়ত তোমার এই সন্দেহের ছায়াটাকে ঘনীভূত করেছে।

একথা আমি পরে বুঝেছি, বড় হয়ে বুঝেছি।

আমার নিভৃত চিন্তার সবখানি জুড়ে কে আর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বেখেছে বল, তুমি ছাড়া ?

অবিরত তোমাকে আর তোমার আচার-আচরণগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখে-দেখে, হঠাৎ একদিন যেন 'বোধে'র একটা জানলা খুলে গেল।

আমি তোমার নিরুপায়তার একটা কারণ আবিষ্কার করে ফেললাম। ছোট-ছোট অনেক ঘটনা, অনেক কথা, জ্ঞানাবধি যত কিছু দেখেছি শুনেছি, সেই টুকরোগুলো জুড়ে-জুড়ে দেখতে থাকলাম তখন—

একদিন আমি তখন খুব ছোট তুমি হঠাৎ একদিন বলে বসলে, মামা, আমিও মিলির মতো আপনাকে বাবা বলে ডাকব।

শুনে বাবা যেন শিউরে উঠলেন, চমকে রেগে-রেগে বললেন, তার মানে ? হঠাৎ মামাকে বাবা ডাকবি মানে ? পাগল নাকি ?

তুমি আবদারের গলায় বললে, 'তাতে কী, আপনি তো আর আমার সত্যি মামা নন ?'

কে বলেছে নয় ? কে বলেছে নয় ?

বাবা দারুণ রেগে উঠলেন, কে তোকে এসব পাকা কথা শেখাচ্ছে?

কে আবার শেখাবে—

তোমার গলায় জোর—আপনারা তো বামুন, আমি কি বামুন? তবে আপনি তো আসলে আমার পালক-পিতা, বাবা বলতে দোষ কী?

বাবা চট করে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, আছে দোষ! সত্যি-মিথ্যে যাইহোক 'মামা' ডাকতে-ডাকতে হঠাৎ 'বাবা' ডাকতে শুরু করবি, লোকে পাগল বলবে না? খবরদার যেন তোর মুখে এ রকম কথা না শুনি।

কতই আর তখন বয়েস তোমার বছর দশ, আমি ছয়, কিন্তু তখনই তো আমার তোমার ওপর দারুণ মায়া, তাই বাবার কাছ থেকে চলে এসে তোমায় সান্ত্বনা দিতে বলেছিলাম, বাবাটা না এত রাগী। কী হয় একটু 'বাবা' বললে?

তুমি উল্টে আমায় ধমক দিলে, এই, 'বাবাটা' বলছিস যে বড়?

ভাল করতে গিয়ে মন্দ।

মনঃক্ষুণ্ণ আমি বললাম, রাগ করে বলেছি।

তোর রাগের কী আছে?

বলে তুমি একটা কঞ্চি না চাঁছতে বসলে।

আমার রাগের কী আছে শুনে আমার খুব দুঃখ হলো, তবু মান খুইয়ে বললাম, যাক গে তোর তো নিজের বাবা আছে।

তখন তো তুই বলতাম তোমায়, তাই না?

রেগে গিয়ে তুমি বললে, বাবা আছে? তবে আমি এখানে পড়ে থাকি কেন? বাবাও নেই মাও নেই ব্যস!

ছেলেমানুষের বুদ্ধি, তবুও লড়ে যাচ্ছি, আহা ছিল তো বাবা?

জানি না, দেখিনি কোনোদিন, মামা আমাদের 'পুরনো বাজারে'র বাড়িতে জিনিসপত্তর দিয়ে আসত। তারপর তোর মা মরে গেল বলে, মা তোকে মানুষ করতে এখানে চলে এল।

আমার তখন মনে হয়েছিল আমরা দুজনেই খুব দুঃখী। তোমার ওপর খুব মায়া এসেছিল। আমার তো তবু বাবা আছে, তোমার তাও নেই।

সেই মায়া এই আজীবনকাল বয়ে বেড়াচ্ছি বিক্রম।

বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি কেন তুমি আমায় জোর করে দখল করে নেবার জন্যে চেষ্টা করনি, কেন যেন বাবার গোঁড়ামীর কাছেই নতিস্বীকার করে বসে আছ!

কিন্তু বুঝে আর কী লাভ হয়েছে বল?

আমি কি তারজন্যে আমার মনকে ফিরিয়ে নিতে পেরেছি?

বিক্রম, হয়ত তোমার সন্দেহ অমূলক, হয়ত মিথ্যাই তুমি নিজে মরলে, আমায় মারলে। কিন্তু সন্দেহ যখন একবার তোমায় গ্রাস করে বসেছে কী-বা করতে পারতে ও-ছাড়া?

অবশ্য আরো একজনকে মেরেছ তুমি।

বিজন আমাদের স্বজাতি, কুলে-শীলে নাকি বাবার চাহিদার সমতুল্য, লেখাপড়াতেও বিজন তোমার থেকে ভাল, বিজন বলেছিল, তোর সঙ্গে যখন জাতে মিলছে না বিক্রম, তবে আমিই যাই তোর মামার কাছে। কোন্ চুলো থেকে কে একটা উটকো লোক এসে মিলিকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে—

তুমি বিজনকে খুন করবার ভয় দেখিয়েছিলে।

হ্যাঁ বলেছিলে মেরে পুঁতে ফেলব

বিজন বলল তুই তো নিজে ভোগ করতে পাবি না, তবে কেন আমার বাসনার হন্তারক হবি?

তখন কী বলেছিলে তুমি সেটা নিশ্চয় ভুলে যাওনি?

তোমার জবাব ছিল, চোখের আড়ালে যা হয় হোক, চোখের সামনে বসে কেউ যে তোমার মুখের গ্রাস তারিয়ে-তারিয়ে খাবে তা তুমি বরদাস্ত করতে পারবে না।

মেয়েদেরকে তোমরা পুরুষ জাতটা চিরদিনই ভোগ্যবস্তু বলেই মনে করে আসছ বিক্রম, তাই ওই তুলনাটাই মনে এসেছিল তোমার।

আমি কিন্তু চুপিচুপি বলেছিলাম, বিজন যা বলছে তাই হোক না বিক্রম তবু তো এখানে থাকতে পাব। রোজ দেখা হবে।

তুমি বললে, ফের একথা বললে, তোকেও মেরে পুঁতে ফেলব। বাঘের মুখের গ্রাস সিংহে নিলে সহ্য হয়, শেয়ালে খেলে হয় না বুঝলি ? কিন্তু বাঘের লোলুপতাই বা প্রকাশ করতে পারলে কই ? তুমি যদি আমাকে জোর করে—

তবে এ-তুলনাটা তুমি ঠিকই দিয়েছিলে বিক্রম। আমার স্বামীকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

শান্ত সম্ভ্রান্ত—অকারণ হিংস্রতায় ভয়ঙ্কর নয়।

আমার মনের বিকৃতিতে আমি তার সত্যিকার মূর্তিটাকে দেখতে পেলাম না। মরতে বসে সব কথাই খুলে বলতে চাই বিক্রম, তুমি তোমার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় আমায় কেড়ে রেখেছ ঠিকই তবু আমি রঞ্জিতকে ভাল না-বেসে পারিনি। বিক্রম ওকে ভীষণ ভালবাসি আমি আর হয়ত সেই ভালবাসা প্রকাশের পরিবেশ হারিয়েছি বলেই ওকে যন্ত্রণা দিই। ওই ঝগড়া-বিবাদ-লাঞ্ছনা-সূত্রেই ওকে কাছাকছি রাখবার আমার এক মূঢ় চেষ্টা।

আমি ওর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেলে ও হয়ত আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে, সেটা সওয়া তো বড় শক্ত।

বিক্রম, কেন তুমি একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করলে না ?

কেন সুখী সহজ একটা জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করলে না ? কেন চিরদিন আমার বাড়াভাতের থালার সামনে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলে বসে-বসে অতৃপ্ত নিঃশ্বাস ফেললে ?

তা যদি না করতে তুমি, আমিও হয়ত আমার জীবনটাকে সুখী সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারতাম। জীবনটা কি বৃথা অপচয়ের মতো সস্তা জিনিস বিক্রম ?

কিন্তু আর একথা বলার অধিকার নেই আমার, এখন আমি নিজেকে নিজে শেষ করবার সংকল্প স্থির করে ফেলেছি। বেঁচে কী লাভ বল ? আমি কি সেই মিলি আছি আর ?

এখন আমি মদ খেয়ে মাতলামি করি, যা ইচ্ছে গালাগাল করি, আর যে নয়নতারাকে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই তার প্রসঙ্গটাই কাজে লাগিয়ে নিজের চলে আসবার পথ পরিষ্কার করি।

হ্যাঁ, 'নয়নতারা'কেই ক্রমাগত রঙ্গমঞ্চে টেনে আনছি কিছুদিন থেকে। চলে যাবার একটা যুক্তি দেখাতে হবে তো? আহা, এ সময় যদি বাবার অর্থহীন জীবনের বোঝাটা নামিয়ে ফেলতে পারতেন। সত্যিকার কারণ থাকত আমার একটা।

কিন্তু কেন আমি চলে যাচ্ছি?

আমি তো এখানেই মরতে পারতাম।

কত সময়ই তো ভেবেছি।

পারিনি।

নির্লজ্জের মতো স্বীকার করছি শেষবারের মতো আর একবার তোমাকে না দেখে মরতে পারব না। অনেক দিন দেখিনি। তোমায়।

এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যেও ভেবে আনন্দ হচ্ছে স্টেশনে নেমেই দেখতে পাব, তুমি দাঁড়িয়ে আছ তোমার রাজার মতো চেহারাটি নিয়ে। এমনিই চলে যাব ঠিক করেছিলাম, রঞ্জিত সাহেব ছাড়ছেন না তোমায় টেলিগ্রাম করে দিলেন।

অতএব তুমি আসবে।

তুমি সেই পোস্টটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর যেই গাড়িটা এসে থামবে, দ্রুত এগিয়ে আসবে গাড়ির জানলায় চোখ ফেলতে-ফেলতে। কী অপূর্ব সুন্দর সেই দৃশ্য!

বিক্রম আমায় কেন মরতে হচ্ছে?

পৃথিবীর যেখানে যা আছে সব ঠিক থাকবে, তুমি থাকবে, অথচ আমি চলে যাব! আমার জন্যে কেউ একটু চোখের জলও ফেলবে না। কে ফেলবে? কেন ফেলবে?

তুমি?

তোমার চোখের কোথাও কি জল আছে? বিক্রম? সেখানে কী শুধুই আগুন।

বিক্রম, আমরা প্রত্যেকেই কত অসহায়?

শুধু ভাগ্যের কাছেই নয়, নিজের কাছেও!

খুব একটা মজারও আমরা তাই না? নিজেকে নিজের মুঠোয় চেপে ইচ্ছে-মতো চালাতে কী অক্ষমতা, অথচ অন্যকে মুঠোয় চেপে নিজের বাসনার অনুকূলে চালাতে চাই। আর সেই না পারলে পাগল হই, মাতাল হই মরতে যাই!

পলি

পলি ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। যদিও ঘরে রাজকীয় একখানা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে, আর তার সামনে পড়ে রয়েছে—তদুপযুক্ত একটা বসবার আসনও, তবু পলি সারা ঘরে ঘুরেই বেড়াচ্ছে চিরুনি নিয়ে।

পলির চুল খাটো করে ছাঁটা, কিন্তু তেলের অভাবে জট পড়েছে বেশি। সভ্য সমাজে চললে তেলটা অচল, একথা যখন পলির মা একদিন শিখিয়ে ছিল কিশোরী পলিকে, তখন পলি নিত্য দু-বেলা চুলে জবজবে করে তেল মেখে মায়ের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছে। ক্রমশ যখন মা বিরক্তি প্রকাশটা বন্ধ করেছে, তখন পলি তেল মাখাটা বন্ধ করেছে। এখন রুক্ষ চুল জটে ভর্তি।

দরজার সামনে রঞ্জিতমোহন এসে দাঁড়ালেন, চমকে বলে উঠলেন, ও কী হচ্ছে অত ইয়ে করছিস কেন—চুলগুলো ছিঁড়ে যাবে যে?

পলি তেমনি জোরে-জোরে হিঁচড়োতে-হিঁচড়োতে ঠাণ্ডা গলায় বলল, এইটা বলতে আপনি কষ্ট করে নিচে থেকে এলেন?

রঞ্জিতমোহন ঈষৎ থমকে গিয়ে বললেন, না, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে এসেছি।

পলি তাকিয়ে রইল।

'কী বলুন ?' এটা আর বলল না কষ্ট করে। বৃথা কথা বলে না পলি।

রঞ্জিতমোহন বললেন, তোমার বন্ধু সোমার দাদা এসেছেন, এঁকে আমাদের লাইব্রেরি ঘরটায় একবার নিয়ে যাও।

পলি ভুরু কুঁচকে বাপের পিছন দিকটায় উঁকি দিল। তাই বটে, সোমার দাদা দাঁড়িয়ে। পলির হাড় জ্বলে গেল, অথবা পলির সদা জ্বলন্ত হাড়টা আরো তেতে উঠল, পলি জট ছাড়ান চুলটাকে আরো চিরুনি চালিয়ে নতুন জট পড়াতে-পড়াতে বলল, সোমা জানে। ও নিয়ে যেতে পারবে।

কী মুশকিল, সোমা আসতে পারলে তো আসতোই। সোমার জ্বর হয়েছে—

সোমার দাদাকে পলি চেনে না তা নয়, তবে আলাপ বিশেষ নেই, পলি তো ইচ্ছে করে আলাপ করতে এগিয়ে যাবে না ? আর ওই নাক-উচুটাও চেষ্টা করেনি কোনোদিন।

পলি ওকে নাক-উচুই বলে। ইউনিভার্সিটিতে পলির সঙ্গে একটু কথা কইতে পেলে হতভাগা ছোঁড়াগুলো বর্তে যায়, ছুতো খুঁজতে ঘুর-ঘুর করে, আর এই নাক-উঁচুটা কি-না নিত্যি পলিকে নিজের বাড়িতে দেখতে পেয়েও, যেন দেখতেই পায় না। বড়জোর সোমা বাড়ি আছে বা নেই, সোমা তক্ষুণি ফিরবে না দেরি হবে, এই সংবাদ পরিবেষণ ব্যস।

আজ হঠাৎ এত সপ্রতিভ। মতলবটা কী ?

তবে সোমার জ্বর শুনে একটা প্রশ্ন করতেই হয়, কখন জ্বর হলো সোমার ?

পরশু থেকে। আপনি তো কতদিন যাননি। সোমা একটা বইয়ের কথা বলছিল, আপনাদের স্টাডিরুমে নাকি দেখেছে একবার। একটু দেখতাম—বলেছি আপনার বাবাকে—

রঞ্জিতমোহন তাড়াতাড়ি বলেন, এর আর বলাবলির কী আছে ? সোমার দরকার। সে নিজে আসতে পারছে না—যা রে পলি—

বাইরের লোকের সামনে বাবার এই হইচই করে সহজ হবার চেষ্টা দেখে মনে-মনে জোর হাসি হেসে ওঠে পলি ! বেচারা হতভাগ্য

ভদ্রলোক, স্ত্রী 'তালাক' দিয়ে চলে গেছে। কী মর্মান্তিক অবস্থাতেই কাটাচ্ছেন, কথাবার্তা তো নেই বললেই হয়, অথচ বাইরের লোক দেখেই—

পলি চিরুনিখানা লোফালুফি করতে-করতে বলে, আপনিই বরং টকাটক চলে যান না মিস্টার মুখার্জি আমার থেকে আগে পৌঁছে যাবেন।

রঞ্জিতমোহনের মুখ লাল হয়ে ওঠে, এই পরিস্থিতিটাকে আবার কীভাবে ম্যানেজ করে তোলা যায়।

ওই ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির ছেলেটি কি কোনো মেয়েকে এরকম অদ্ভুত অ-ভব্য কথা বলতে শুনেছে? কিন্তু দেবনাথ এতে খুব একটা চমকে ওঠেনি। প্রত্যক্ষে না হলেও পবক্ষে সে অনেক কথাই শুনেছে পলির সোমা-মাধ্যমে। পলি যে বাপকে 'মিস্টার মুখার্জি' এবং মাকে 'ম্যাডাম' অথবা 'মিসেস মুখার্জি' বলে, এ-তথ্য দেবনাথের জানা। আরো অনেক কিছুই জানা। 'দাদা' ব্যতীত সোমার আর এমন কে আছে যার কাছে মন-প্রাণ উজাড় করে সব গল্প করতে পারে? মীরা-ধীরাদের বলতে ভয় হয়, কখন কাকে বলে বেড়াবে, মুখে-মুখে পল্লবিত হয়ে হয়ত বা পলিদের বাড়ি পৌঁছে যাবে, যার ফলশ্রুতি বন্ধুবিচ্ছেদ।

পলি আর সোমার এই বন্ধুত্বটা যে এযাবত কাল টিঁকে আছে, সেটা কেবল মাত্র সোমার বুদ্ধি বিবেচনার ফলে। সোমা স্তাবকতা করে মবে না, অন্য কিছু-কিছু মেয়ের মতো, আবার সোমা আরো কিছু অন্য মেয়েদেব মতো টক্কর দিতেও চেষ্টা করে না সুন্দরী আর ধনী দুহিতা পলির সঙ্গে কিছুজন তো আবার পলির আড়ালে এমন নিন্দে করে বেড়ায় যে পলির কানে এসে পৌঁছতে দেরি লাগে না।

অতএব পাঠ্যাবস্থার বহু বন্ধুব সঙ্গেই পলির বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সোমা বড় সাবধানী আর যত্নবান। সোমা বুঝি-বা পলিকে কিছুটা পড়ে ফেলতে পেরেছে, সোমা তার সেই পঠিত-গ্রন্থের সারাংশ দাদাকে শুনিয়ে বাঁচে। সোমার মধ্যে পলির জন্য একটি বিশেষ ভালবাসাও আছে, যে-ভালবাসাটি প্রায় 'বাৎসল্য স্নেহের' সমগোত্র।

হয়ত পলির সব থাকতেও ওই সর্বহারা ভাবটা সোমার মনকে ব্যাকুল করে, তাই পলির প্রতি তার এমন মমত্ববোধ।

সোমা যখন তার দাদার কাছে পলি-সংবাদ সরবরাহ করে তখন সোমা ওই স্নেহ রসটিতে জারিত করে-করে। তবে দেবনাথ সোমার ওই সুকোমল ভাবটিকে প্রশ্রয় দেয় না, বলে তুই যতই সিমপ্যাথির কোটিং লাগিয়ে ওর কথা বলিস, আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি তোমার বান্ধবীটি কী চীজ! বড়লোকের ধিঙ্গি মেয়ের একখানি প্রতীক।

কাজেই দেবনাথ চমকাল না, আর রঞ্জিতমোহন যখন মেয়ের কথায় থতমত খেয়ে কিছু ভেজাল খুঁজছেন তৎক্ষণে দেবনাথ বেশ জোরের গলায় বলে উঠল, না আপনিই যাবেন।

এ আবার কী! পলির ওপর আদেশের সুর।

রঞ্জিতমোহন চমক খান। পলিও।

পলি ভুরুটা একটু কুঁচকে বলে, কী ব্যাপার! আপনার হুকুম নাকি?

দেবনাথ শান্তগলায় বলে, আমার নয়, সভ্যতার হুকুম।

বাঃ! আপনি তো বেশ ভাল-ভাল কথা বলতে পারেন, পলি একটা হাই তুলে বলে, চলুন তবে। সভ্যতার হুকুম! ও বাবা—

পলির ওই হালকা-পাতলা দেহটা নিয়ে যতটা সম্ভব মন্থরগতিতে এগোয় পলি সিঁড়ির দিকে, সিঁড়িতে ওঠেও তেমনি ভঙ্গিতে।

রঞ্জিতমোহন সেইদিকে তাকিয়ে থাকেন, হঠাৎ তাঁর চোখের তারায় যেন একটা আলোর স্পন্দন খেলে যায়।

চাবিটা খুলে দরজা হু-হাট করেই পলি একটা সোফায় বসে-পড়ে বলে, দেখুন যত ইচ্ছে।

দেবনাথের বোধহয় এতটা ধারণা ছিল না। তাই ঢুকেই থমকে দাঁড়াল মুগ্ধ-মোহিত দৃষ্টিতে যাকে বলে একবার অবলোকন করে নিল, তারপর পলির দিকে তাকায়, খুব নিরীহ গলায় বলল, বাতে ভুগছেন কতদিন!

কী? কিসে ভুগছি?

ছিটকে ওঠে পলি।

বলছি, আপনার বেশ বাত রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাই জিগ্যেস করছি কতদিন ভুগছেন?

পলি বাঘিনীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আপনারও তো দেখছি মাথার গোলমাল, কতদিনের রোগ?

আমার? তা বলতে হয় জন্মাবধিই। মানে—মাথাটা তো গোলই, আর তার মধ্যে 'মাল' রয়েছে ভালমতোই। আপনার মতো ভূষিমাল নয়। তবে আপনার বাতটার জন্যেই ভাবনা, ভাবি বিচ্ছিরি রোগ। এত হালকা শরীর আপনার, নামের সঙ্গে কী আশ্চর্য রকমের মিল, অথচ হাঁটতে কষ্ট পাচ্ছেন ঠিক আমার পিসিমার মতো। অথচ পিসিমার ওজন হচ্ছে—

অসহ্য!

পলি উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণগলায় বলে উঠল, কী অভিসন্ধি নিয়ে এসেছেন বলুন তো? বইটা তো স্রেফ্ ছল।

ছল! বলেন কী? বইটার জন্যে মরে যাচ্ছে সোমা, পরশু থেকে জ্বালাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, একেবারে ভুল বলেননি, অভিসন্ধি একটা আছে। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল আপনার বাবার এই লাইব্রেরিটা একটু দেখি। কী বিরাট কালেকশন। দেখলে এখানেই পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সত্যি এতটা ভাবিনি। সোমা অবশ্য বলেছে, কিন্তু—

পলি একটা পাক খেয়ে জানলার ধারে সরে গিয়ে ঝাঁজালো গলায় বলে, কিন্তু আপনার ব্যবহার দেখে তো মনে হলো বাবার বইয়ের কালেকশানের থেকে বাবার মেয়েটি বেশি দ্রষ্টব্য।

এটা আবার আমার কোন্ ব্যবহারে প্রকাশ পেল? দেবনাথ একটু ভেবে নিয়ে হেসে ওঠে, ও হো হো! নাঃ, এটা আপনার আত্মঅহমিকা। নিজের সম্বন্ধে ওভার এস্টিমেট থাকলেই এরকম মনে হয়।…আপনার হাঁটার কষ্ট দেখে একটু কষ্ট হলো তাই। আমার পিসিমা বেচারী—

'থামাবেন আপনার পিসিমার কথা!

পলি প্রায় গ্রাম্য মেয়েদের মতো ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ভেবেছেন কী? সস্তামার্কা সিনেমার গল্পের মতো নায়িকাকে রাগিয়ে দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে অবশেষে তাকে প্রেমে পড়ানো? ও মতলব ছাড়ুন।

দেবনাথ ততক্ষণে একটা র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে আলতো আঙুল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখছে, পলির কথায় দরাজ গলায় হেসে ওঠে, সাধে বলেছি আপনার আত্ম-অহমিকা। ছেলেরা আপনাকে দেখলেই প্রেমে পড়বার জন্যে মরবে, এমন ভুল ধারণা কেন? বসে থাকুন তো চুপচাপ, আমায় একটু দেখতে দিন।

বসে থাকতে আমাব দায় পড়েছে। দেখুন না যত ইচ্ছে—আমি চলে যাচ্ছি।

পলি দরজার দিকে সরে আসে।

সরে আসে, কিন্তু বেরিয়ে আসে কী?

আসে না।

অকারণ দরজাটা ধরে খোলা-বন্ধ করতে থাকে।

দেবনাথ বলে, নাঃ চলে গেলে মুশকিল আছে। নিজেকে চল্লিশ দস্যুর গুহায় আলিবাবাব মতো লাগবে। ইচ্ছে হবে সব নিয়ে চলে যাই!

ইচ্ছে হবে সব নিয়ে চলে যাই। চমৎকার তো।

পলি ধিক্কার দেয়।

কিন্তু সোমার দাদা নির্বিকাব।

বলে কিনা, ইচ্ছে 'হবে' কি, হচ্ছেই অলরেডি। মনে হচ্ছে অনেকগুলো গাধা নিয়ে এলে, বেশ তার পিঠে চাপিয়ে—

দেবনাথ একখানা বই র‍্যাক থেকে নামায়।

পলি উষ্ণ।

পলি বলে, আপনার এ মনোভাবটা বোধহয় বেশ সভ্য?

তা বোধহয় নয়। কিন্তু মনোভাবের ওপর কি শাসন চাপানো যায়?

ওঃ। সেটা যায় বুঝি শুধু অন্য বাড়ির মেয়ের ওপর ?

আহাহা, আপনি এখনো সেই রাগ পুষে রেখেছেন ? সত্যি বাবার সঙ্গে আপনি এমনভাবে কথা বললেন, খুব খারাপ লাগল। ওঁর সঙ্গে এভাবে কথা কন কেন বলুন তো ?

পলি উদ্ধতভাবে বলে, আপনিই বা হঠাৎ আমার গার্জেনের রোল নিয়ে আসছেন কেন বলুন তো ? আমার বাড়িতে আমি কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলি সেটা আমি বুঝব।

দেবনাথ দেখেশুনে দু-খানা বই নিয়ে বলে, দেখুন এই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে অনেক কথা হতে পারে, কিন্তু এখন থাক। আর বেশি ঝগড়া বাধলে আপনি যা মেয়ে হয়ত বলে বসবেন, 'গেট আউট।' আর আমাদের বাড়ির গেট ডিঙোবেন না। আমার পক্ষে দারুন লোকসান হবে সেটা। না বলে পারছি না, প্রথম দর্শনেই দারুনভাবে এই ঘরটার প্রেমে পড়ে গেছি। আসতেই হবে বারবার। আচ্ছা চলি। মেজাজটা একটু ভাল করে ফেলুন। কিছু যখন জ্বালাবার থাকে না, মশাল তখন নিজেকেই জ্বালিয়ে শেষ করে জানেন তো ?

পলি ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেমন একটা পরাজিত-পরাজিত চোখে।

জ্ঞান দিয়ে যাওয়া হলো।

আমার হঠাৎ কী হলো ?...ওই হতচ্ছাড়া ছেলেটা আমায় এ-রকম 'ডাউন' করে দিয়ে চলে গেল মানে ? আমি ওকে যাচ্ছেতাই করে শুনিয়ে দিতে পারলাম না ? আচ্ছা আসুক আবার। দেখে নিচ্ছি।...আসবেই নিশ্চয়, আসতে বাধ্য। সত্যি তো আর বই দেখে মূর্ছা যায়নি। বইয়ের আবার অভাব কী, 'ব্রিটিশ কাউনসিলে' যা না, 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি'তে যা না। লাইব্রেরি ঘরের প্রেমে পড়ে গেছেন। হুঁ।...ওই একটা ছুতো। এ বাড়িতে আসা-যাওয়ার পথ পরিষ্কার রাখতে হবে তো।...আমায় আর অত বোকা বোঝাতে হবে না চাঁদু, তোমার থেকে ঢের চালাক আমি।...

কি জানি এ-বাড়ির মালিকও এ-ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন কি-না। মিসেসটিকে ঘাড় থেকে নামিয়েছেন, এবার মেয়েটাকে নামাতে পারলেই নিজের লাইন ক্লিয়ার।...আচ্ছা—তোমাদের ষড়যন্ত্র আমি বার করছি।

পলি বইয়ের ঘরের দরজা হাট করে রেখে দিয়ে চটির শব্দ করতে-করতে নেমে এল কড়া কঠিন একটা প্রশ্ন নিয়ে রঞ্জিতমোহনের দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কী ভেবে ফিরে এসে নিজের ঘরে বসে পড়ল।

পরাজয়ের অপমানে মনটা জ্বলছে, ওই নাক-উঁচুটার নাক ক্ষইয়ে দিতে না-পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই পলি নামের মেয়েটার।...কী আশ্চর্য, পলিকে ও বাড়ি বয়ে এসে অপমান করে চলে গেল, আর পলি বোকার মতো বসে থাকল?

শোধ নেবার উপায় বন্দনা করতে থাকে পলি। আবার যেদিন আসবে, অগ্রাহ্য করবে? কথা বলবে না?...ডেকে-ডেকে কথা বলতে এলে অবহেলাসূচক জবাব দেবে?...কিন্তু তাতে আর কতটুকু হবে?...হয়ত বুঝতেই পারবে না পলির সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ধিক্কার।

এলে সত্যিই বলবে, 'গেট আউট?'

নাঃ চট করে সে-পরিস্থিতি আনান যাবে না। তাছাড়া—তাহলে তো মিটেই গেল সব, শেষ হয়ে গেল খেলা।...খেলিয়ে-খেলিয়ে মারলে তবেই না শিকার করা। মাছ বঁড়শি গিললেই টেনে তুললাম, কিম্বা বাঘের ডোরা দেখতে পেয়েই গুড়ুম করলাম ও কোনো কাজের কথা নয়।

অনেক ভেবে ঠিক করল পলি, এখন অন্য চাল চালতে হবে। এলে পরে খুব দুঃখিত ভাব দেখিয়ে আজকের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ভান করতে হবে। দু-চার দিন খুব ভাল ব্যবহার করতে হবে, এমন ভাল যে নাক-উঁচুটা ভেবে বসবে পলি মুখার্জি বুঝি-বা ওর প্রেমেই পড়ে গেল, তারপর?...তারপরের কথা ভাবতে গিয়ে পলির মুখটা উল্লসিত হয়ে উঠল।

তারপর যখন প্রশ্রয় পাওয়া মনখানি নিয়ে বেশি এগোতে

আসবে, দেব এমন একখানি দাওয়াই। উঁচু-নাক থেবড়ে যাবে। ভাবতে-ভাবতে পলি যেন প্রতিহিংসার চরিতার্থতার আহ্লাদ অনুভব করে।...শুধু আজ বলে নয়, সোমার দাদাটা—পলি মনে-মনে বলতে থাকে, সোমার দাদাটা বরাবর আমায় অপমান করে আসছে। অপমানই তো। অগ্রাহ্য মানেই অপমান।...যেন পলি মুখার্জিকে দেখতেই পেতেন না উনি।...আসলে এ-ও একটা 'শো'। এইতো সেই আমি দু-পাঁচ দিন যাইনি, সেই একটা ছুতো করে চলে আসা হলো। সোমার জ্বর, সোমা আসতে পারছে না, সব বাজে কথা।... তাহলে তো সোমা দু-লাইন লিখে ওদের সেই বাচ্চা ঝিটাকে দিয়ে বলে পাঠাতে পারত।...

আমি যাইনি, আমার আর যেতে ইচ্ছে করে না।

গেলেই তো মুখটি করুণ-করুণ করে জিগ্যেস করতে বসবে, পলি তোর দাদুর অসুখ আবার বেড়েছে বুঝি? মাসিমাকে সুটকেস-টুটকেস নিয়ে চলে যেতে দেখলাম।

মিসেস মুখার্জিকে 'মাসিমা' বলে ডেকে কথা বলবে এমন হিম্মত নেই, তবু আমার কাছে বলবে 'মাসিমা'। অনেকদিন আগে 'তোর মা' বলে-বলে কথা বলত, আমি একদিন ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। স্রেফ বলে দিয়েছি, শুধু-শুধু 'তোর মা তোর মা' করিস কেন? আমি তো 'মিসেস মুখার্জি' বলি। সোমা অবিশ্যি হেসেছিল, বলেছিল ধ্যাৎ। কিন্তু পরে তো বিশ্বাস করতেই হলো।

ঠাণ্ডা ওকে আমি আরও একদিন করে দিয়েছিলাম। সেই অবধি সামলে গেছে।...ঠাণ্ডা করে দেব না? কথার মধ্যে কথা খালি 'দাদা'।...দাদা এই বলে, দাদা এই ভালবাসে, দাদা এই ভালবাসে না—কড়া করে বলে দিলাম 'তোর দাদার চরিতামৃত' শোনবার জন্য এখানে আসি আমি?...খুব ঘাবড়ে গেল।

অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগল, দাদা ছাড়া আমার তো আর কোনো বন্ধু নেই ভাই, তাই সবসময় দাদার কথাই এসে পড়ে।

আমি যতক্ষণ থাকব যেন এসে না পড়ে।

সামলে গেছে সোমা।

ভালই হয়েছে। ও-যে ভাববে আমি ওর দাদার প্রসঙ্গে বিভোর হচ্ছি, তার মধ্যে আমি নেই।...অবিশ্যি সে-প্রসঙ্গ উঠলে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করবার বেশ সুবিধে-সুযোগ হতো। মজার চাষ করা যেত খানিকটা।...কিন্তু ওকেও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।...এই যে মিস্টার মুখার্জির বন্ধু বিমান মিত্তিরের সেই গালে-জুলপি ছেলেটা, যে নাকি কিসের চেষ্টায় মাঝে-মাঝে মুখার্জি সাহেবের কাছে আসে, আমার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য কী আকুলতা। ওটাকে নিয়ে কিছুদিন মজা করেছিলাম, হঠাৎ দেখি মিস্টার মুখার্জি আমার কাছে এসে শুধোতে বসলেন, ওই ক্যাবলা ছেলেটার মধ্যে আমি এমন কী দেখলাম যে—

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম 'যে'?

মুখার্জি সাহেব ব্যস্ত হলেন, না মানে, বিমান বলছিল, ছেলেটা নাকি বাপের কাছে কি বলেছে-টলেছে, আর আবদার করছে—আমি যদি ওকে একবার 'ও-দেশ' ঘুরিয়ে এনে কুলিন করে নিই।

শুনে আমি এমন হাসতে শুরু করেছিলাম, যে মুখার্জি সাহেব হতভম্ব।...আমার হাসি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তাঁর বোধহয় পায়ে ব্যথা হয়ে গেল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে গেলেন, উঃ! বাঁচা গেল! তোমার মা তো একেবারে হয়ে-হয়ে রয়েছিলেন।

বললাম, ওঃ মিসেস মুখার্জির কথা বলছেন? আগে বলতে হয়? তাহলে হয়ত ওই ক্যাবলাটার সঙ্গেই ঝুলে পড়তে চাইতাম।...

মিস্টার মুখার্জি হঠাৎ হেসে ফেলেছিলেন, বলে উঠেছিলেন, আচ্ছা তোর মাথায় এতো দুষ্টুমি গজায় কী করে বল তো?

গম্ভীর উত্তর দিয়েছিলাম, যেমন মাটি; যেমন চারা; যেমন সার তেমনই হয়।

তবু তখনও ওই ভদ্রলোককে কিছুটা সহ্য করতে পারতাম, কারণ

তখনো নয়নতারার খবর জানা ছিল না।...কিছুকাল আগে থেকে অবশ্য 'মনিঅর্ডার মনিঅর্ডার' গোছের কী একটা ব্যাপার নিয়ে সেই মহিলাটিকে ফাটাফাটি করতে দেখেছি, কান করিনি।...কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো কানে এসেই গেল, মহিলা বোধ করি ইচ্ছে করেই আমার কান পর্যন্ত টার্গেট করেছিলেন সেদিন।...আমি অবশ্য না-শোনার ভানই করেছি। কিন্তু নামটা আমার কানে গাঁথা হয়ে গেছে। গাঁথা হয়ে আছেই বলা যায়।

আমাকে আবিষ্কার করতে হবে কে এই নয়নতারা। কী সম্পর্ক তার সঙ্গে মুখার্জি সাহেবের।.. অবশ্য সম্পর্কটা কী, তা আবিষ্কার করার দরকার নেই, জলের মতোই স্পষ্ট, তবু দেখি সত্যবাদী ভদ্রলোক কী উত্তরটা দেন।...

সত্যি বলতে সেদিন মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।...যতই অশ্রদ্ধা করি ভদ্রলোককে। তবু কোথায় যেন একটা বিশ্বাস ছিল, ভদ্রলোকের চরিত্রে আর যত যাই দুর্বলতা থাকুক, 'চরিত্র দৌর্বল্যে'র মতো খারাপ একটা-কিছু থাকতে পাবে না।...তাই হঠাৎ ভীষণ আহত হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। যেন কেউ আমার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করেছে, খুব অপমান করেছে, আমাকে ঠকিয়েছে।...যাক এখন ও-সব সেন্টিমেন্ট-ফেন্টিমেন্টের বালাই নেই আমার। নির্ভেজাল ঘৃণা নিয়ে আছি ভাল।

মিসেস মিলি মুখার্জির ঘরটার সামনে দিয়ে যে তাকিয়ে যেতে পারি না, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে দরজাটা পার হই, সেটা একটা খেয়াল!...আর হঠাৎ-হঠাৎ যে-বিচিত্র সব কস্‌মেটিকের সংমিশ্রণজাত একটা ভীষণ পরিচিত একটা গন্ধ পাই, সিঁড়িতে নামতে ড্রইংরুমে ঢুকতে সেটা অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর সুরেশ এবং হীরালাল দু-জনে মিলে আপ্রাণ চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যখন যাচ্ছেতাই-যাচ্ছেতাই সব খেতে দেয়, তখন রাগে মাথা জ্বলে ওঠে বলেই চোখ জ্বালা করে ওঠে। মন বলে কোন জিনিসই নেই আমার তা' সেন্টিমেন্ট মন কেমন।...সোমার জন্য

হয়েছে শুনে আমার তো মন কেমন করা উচিত ছিল, এতোদিনের বন্ধু! কিন্তু মোটেই মন কেমন করছে না আমার, এসব জোলো-জোলো সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না পলি মুখার্জি।...তবে হ্যাঁ, কর্তব্য হিসেবে একবার যাওয়া চলে।...কিন্তু এখন নয়, মোটেই নয়, গেলে হয়তো ওই মস্তানটি ভেবে বসবে বুঝি ওর সঙ্গে দেখা কববার তালেই—

উঁহু। কর্তব্যের চিন্তা চলবে না।

ও-তো নিজেই আসবে বই ফেরত দেবাব ছুতোতেই আসবে, তখন—

নাঃ এখনই ঠিকমতো ঠিক করে উঠতে পারছি না, তখন কী ব্যবহার করা উচিত! আগে যেমন ভাবছিলাম কিছুটা খেলিয়ে তারপর শিকার, সেই ভাবনাটাই থাকবে? না কি যেই আসবে, সেই শিক্ষা দিয়ে দেব?...ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু কিছু তো একটা করতেই হবে, অপমানের প্রতিশোধ তো চাই!...পলি মুখার্জিকে অপমান করে কেউ পার পায় না একদা পলির অসহায়তার সুযোগে যারা যা করেছে, সুদে-আসলে তার শোধ দিয়েছি, দিয়ে চলেছি।... ওই যে এবাড়ির কর্ত্রীর সাধের আয়া মালতি! যার বিহনে কর্ত্রী শ্রীমতী মিলি মুখার্জি এক ঘণ্টাও কাটাতে পারতেন না, তার মাথা ধরলে নিজের মাথা ধরিয়ে ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়তেন। সেই মালতিকে আমি কীভাবে এ-বাড়ি থেকে বিদায় করেছিলাম হুঁঃ! দেবনাথ সরকার, তোমার রেহাই নেই। কিন্তু আসবে তো?

উঃ! দেখলাম বটে একখানা মাল—

দেবনাথ হাতের বই দুখানা সোমার বিছানায় ধপ করে ফেলে দিয়ে নিজেও ধপ্ করে বসে পড়ে বলে, দ্রষ্টব্য একখানি।

সোমা বইটা হাতে নিয়ে একটু হেসে বলে, দেখালাম তাহলে তোমায় একটা দেখবার মতো জিনিস।

দেবনাথ একটু গম্ভির হয়ে বলে, তা দেখালি।...তবে দেখে খুব দুঃখও হলো—

ওর বাবার জন্যে তো ?

সোমা তাড়াতাড়ি বলে, সত্যি আমারও খুব দুঃখ হয় পলির মা-বাবার জন্যে। একটামাত্র মেয়ে—

দেবনাথ বলে ওঠে, আমি কিন্তু ওর মা-বাবার দুঃখে বিগলিত হচ্ছি না। দুঃখ ওদের ওই সবে-ধন নীলমণিটির জন্যই।···

ওর জন্যে ? ওর জন্যে তোমার দুঃখ হতে গেল ?

তা গেল—

দেবনাথ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, জীবনের এমন অপচয় দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়। দেখে মনে হলো মেয়েটা যেন নিজেকে একটা যাচ্ছেতাই রকমের বিদঘুটে করে ফেলবার সংকল্প নিয়েই আসরে নেমেছে।

তাই তো—

সোমা বলে, আমারও তো দেখে-দেখে তাই মনে হয়। আসলে ও খুব ভাল, খুব সুন্দর একটা মেয়ে হতে পারত, ইচ্ছে করেই নিজেকে নষ্ট করছে—

তুই তো বন্ধু, তুই চেষ্টা করতে পারিস না—

চেষ্টা ? হুঁঃ।

সোমা দু-হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গি দেখায়, বলতে গেলে তো আরো বাড়ায়। অনেকদিন আগে একদিন বলেছিলাম, মা-বাবাকে এভাবে কথা বলিস ? তোর কষ্ট হয় না ? এ-রকম ঠিক নয় রে— মুখের ওপর বলে দিল জ্ঞান দিতে আসিসনে! জ্ঞান-ফ্যান দিতে এলে আর আসব না তোর বাড়ি। মা-বাবাকে বলতে কষ্ট হবে! হাতি হবে! আহ্লাদ হয় বুঝলি ? ওনাদের সঙ্গে যত বিচ্ছিরি করে কথা বলি, তত আহ্লাদ হয় আমার···সেই থেকে আর বলি না বাবা! যা মেয়ে হয়তো সত্যিই আর আসবে না! আসতে ভালবাসে! সত্যি কেন যে এমন হয়েছে। মাঝে-মাঝে মনে হয় মাথায় গণ্ডগোল আছে।

দেবনাথ অন্যমনস্কভাবে বলে, গণ্ডগোল তো একটা আছেই

কোথাও।…কেউ যদি সহানুভূতি নিয়ে ওকে বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে হয়তো—

সোমা একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, তা তুমিই লেগে পড না দাদা—

দেবনাথও একটু হাসে, তাই ভাবছি—

সোমা মনে-মনে বেশ একচোট হেসে নেয়, সেটাই যে ভাবতে বসেছ, তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরে গেছি দাদা, ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝে ফেলেছি।…জিনিসটা বড় ভয়ানক, কিছুতেই চাপ দেওয়া যায় না। স্রেফ্ আগুনের মতো। জ্বললে তাকে লুকোবে কার সাধ্যি ?…কিন্তু দাদা হে ওই মেয়েটি তো মেয়েটি নয়, একটি অনাসৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া। ওকে তুমি উদ্ধার করবে ? তাহলেই হয়েছে। নিজেই ডুববে।…জানি না—ডোবাটা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা আছে না দর্শন মাত্রেই ডুবে বসে আছ।…দেখেছ তো আগেও, কতবারই তো দেখেছ, হঠাৎ আজকেই এমন উদ্‌ভ্রান্ত কেন ? 'পঞ্চশর' বুঝি নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন !

তবে সোমা ভিতরে-ভিতরে দাদাকে একটু ভয়ও করে। দাদা যতই স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘিরে রেখে থাকুক, আর বন্ধুর মতো ব্যবহার করুক, তবু দাদাই তার অভিভাবক স্বরূপ। বাবা তো থেকেও নেই, তাঁর যে একটা বড় হয়ে যাওয়া মেয়ে আছে, তার খেয়ালই নেই।

সমীহর বসেই সোমা এখন আর নাড়াচাড়া করল না দাদাকে। দেখা যাক অবস্থা কোন্ দিকে গড়ায়।

পলি ক্রমশঃই অপমানিত বোধ করছে।

সেদিনের অপমানের শোধ নিতে না পারাই এই উত্তরোত্তর অপমান বৃদ্ধির কারণ। পলি ল্যাজে পাড়ানো সাপিনীর মতো ফুঁসে বেড়াচ্ছে।…ভেবেছে কি লোকটা ? আর এলই না মানে ?…খুব তো ঘটা করে বলা হলো, 'আপনার বাবার গ্রন্থমন্দিরটির প্রেমে পড়ে যাচ্ছি আমি—' তা সেই কথাটার মর্যাদা রাখতেও আর একবার ?… আসলে সবই ফাঁকার কারবার। শুনতে ভাল-লাগা সাজানো একটা কথা বলে দিল ব্যস।…

আচ্ছা, আমি যদি ওই বই দুটো চেয়ে পাঠাই বিশেষ দরকার পড়ে গেছে বলে ?···কিন্তু কী করেই বা চেয়ে পাঠাব ছাই ! কী বই যে নিয়ে গেছে তাই তো তাকিয়ে দেখিনি।···এমনি লিখে দেব 'বই দুটো'। সুরেশের হাতে শ্লিপ্ পাঠিয়ে।...নাঃ তাতেও কোনো সুবিধে হবে না!···হয়ত 'নাক-উঁচু' এখন বাড়ি নেই, সোমা ব্যস্ত হয়ে সুরেশের হাতেই দিয়ে দেবে।···উঃ কী করা যায় ! ও আমায় জব্দ করে রেখে গেল আর আমি তাই হয়ে পড়ে থাকলাম ?···

পলি ছটফটিয়ে বেড়ায়।

অবশেষে পলি একটা বুদ্ধি খাটায়, সুরেশের হাতে শ্লিপ পাঠায়, সোমা কেমন আছিস ? জ্বর ছেড়েছে ? আমারও শরীরটা ভাল নেই, তাই যেতে পারছি না।···কিছু মনে করিস না।

শেষের লাইনটা লিখতে পলি বারবার ভাবল, বারবার কাটল। 'কিছু মনে করিস না', এই ধরনের একটা অতি গতানুগতিক সৌজন্য-মূলক কথা পলির হাত দিয়ে বেরোচ্ছে ভাবতে ভাল লাগল না। তবু শেষ পর্যন্ত ওই অপছন্দকর কথাটা লিখেই ফেলল। কিছু না লিখলে যেন খাপছাড়া লাগছিল।

সুরেশকে পাঠিয়ে দিয়ে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে অকারণ এঘর-ওঘর করে তিনতলাতেই উঠে গেল পলি।···বইয়ের ঘরের সামনের খোলা ছাদখানা যে এত সুন্দর তাত কোনোদিন লক্ষ্য করেনি পলি, আর এও লক্ষ্য করেনি কোনোদিন, এই ছাদের একটা কোণ থেকে সোমাদের বাড়িটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। সোমার বাবার ঠাকুরঘর, সোমার পড়ার ঘর। ঠাকুর ঘরে পর্দার বালাই নেই—ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছেন মনে হচ্ছে, সোমার পড়ার ঘরের জানলায় পর্দা। উড়ছেও না ছাই, আজ কি বাতাসের স্ট্রাইক ?···দোতলার ওই ছোট-ছোট ঘর দুটোর নেহাৎ অর্ডিনারি ছোট-ছোট জানলাগুলোয় যে দীনহীন ছিটের পর্দা ঝোলান রয়েছে, সেগুলোও নিথর নিস্পন্দ।···কে জানে ওই ঘর-দুটোর কোন্‌টা কার ? তিন রকমের তিনটে মানুষ আছে বাড়িতে—

এক নম্বর হচ্ছে, এক বিপত্নীক প্রৌঢ়, দু-নম্বর তার অবিবাহিত যুবকপুত্র, তিন নম্বর প্রৌঢ়ের তরুণী অনূঢ়া কন্যা।···

নাটকের পাত্র-পাত্রীর প্যাটার্নে নাম বসায় পলি, আর ভেবে অবাক হয়, কিভাবে ম্যানেজ করে ওরা।···জীবনে অনেকবার মনে হয়েছে পলির বাড়িতে কত বেশি জিনিস! প্রয়োজনের অতিরিক্ত এত-এত জিনিসের উপর যখনি মিলি আরো জিনিসের আমদানি ঘটিয়েছে বাড়িতে, তখনি পলির মনে হয়েছে অসহ্য! কিন্তু জীবনে এই বোধহয় প্রথম মনে হলো তার—এ-বাড়িতে কত ঘর! প্রয়োজনের থেকে কতো বেশি।

এবাড়ির পাত্র-পাত্রী তো আরো কম।

'অনূঢ়া তরুণী কন্যা' ঠিক আছে, বিপত্নীক না হলেও বলতে সে পারে 'প্রায়-বিপত্নীক' প্রৌঢ়, কিন্তু বাকি সংখ্যাটি তো শূন্য। অথচ কতগুলো ঘর। অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো জিনিস এনে-এনে বোঝাই করে রাখা হয়েছে।···জীবনে কবে মিলি মুখার্জির বাড়িতে ঠাট বজায় রাখতে গেস্টরুম সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাহার করে, একটা নয় দুটো।···'অন্তরঙ্গ জনেদের' জন্যে একটা অন্তঃপুরের মধ্যে দোতলায়, বহিরাঙ্গজনের জন্যে একটা নিচেরতলায় ড্রইংরুমের পাশে।

এই পৃথিবীতে মিলি মুখার্জির অন্তরঙ্গজন কে আছে জানা নেই পলির।···মিস্টার মুখার্জিরই বা কে? থাকেও যদি কোথাও মিলি মুখার্জির গৃহে কি তাদের—প্রবেশাধিকার ঘটার কোনো সম্ভাবনা আছে?···এখন অবশ্য মিলি মুখার্জি এ-বাসাকে পাখিদের ভাঙা বাসার মতো ত্যাগ করে চলে গেছেন, তথাপি মিস্টার মুখার্জি কি সাহস করবেন?···আপাতত তো দেখা হচ্ছে না কিছু, সাজান-গোছান ঘর। ফাঁকা-ফাঁকা বারান্দা অব্যবহৃত বাথরুম পড়ে আছে আপন মনে।···ড্রইংরুম, তাও দুটো—উপরতলায় নিচতলায়।

অথচ—সোমাদের বাড়িতে—

এ-রকম যে কেন হয়!···

কতজনের কত কম-কম সব থাকে, দরকারই মেটে না, অথচ

কিছু জনের কত বেশি থাকে, ব্যবহারই হয় না। পলির মনে হলো এটা অনিয়ম। পলি নিজ মনে বোধহয় অজ্ঞাতসারেই বলে উঠল, 'কোনো মানে হয় না'—

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ পলিব পিছন দিক থেকে একটা শব্দ উচ্চারিত হলো 'কিসের কোনো মানে হয় না?'

স্বর হাস্যোজ্জ্বল।

পলি চমকে ওঠে। পলি ঘুরে দাঁড়ায়।

আব পলি নিজেনিজেই অনুভব করে তার মুখটায় আলো জ্বলে উঠেছে। হ্যাঁ নিজেই টের পেয়ে যায় পলি, কারণটা হয়ত এই ওই আলোর খেলাটা পলির খুব পরিচিত। পলির চেতনাব গভীবে অনেক সব ছবি জমা আছে, সেই ছবির সঙ্গে হঠাৎ যেন এক হয়ে যায় পলি। আর এই এক হওয়াটাই পলির এই কদিনের সব নিষ্ফল আক্রোশ আর এই কিছুক্ষণের আগের অস্থিব চেষ্টাটার স্মৃতিকে স্রেফ মুছে দিয়ে পলিকে বোবা করে ফেলে।

বোকা হয়ে যাওয়া পলি সেই আলো-আলো মুখে বলে ওঠে, এর মানে? এরকম না জানিয়ে এসে কথা বলে ওঠা 'ম্যানার্স' নয় জানেন?

জানতাম না, জানলাম। যাক—

দেবনাথের মুখেও আলোর ঝলক।

একা-একা কিসের মানে খুঁজছিলেন?

পলি নিজেকে সামলে নেয়, বলে সব কথা কি সবাইকে বলা যায়?

পলি নিজেকে সামলে নিতে পারে, কিন্তু পলি কি তার আলোটা সামলে নিতে পারল? পলিকে তো সেই আলো-আলো মুখটা নিয়েই যদি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

দেবনাথ বলে, আপনার বাবার মতো এমন অদ্ভুত রকমের ভদ্রব্যক্তি দুর্লভ।

পলির মুখে এমন সন্দেহের ছায়া, হঠাৎ? কী এমন ঘটনা ঘটল?

আমার কাছে আশ্চর্যই ঘটনা।...আমি তো অন্তত এ-রকম অবারিত-দ্বার বাড়ি দেখিনি। বাড়িব কর্তার হৃদয় দরজা অবারিত না হলে কি আর বাড়ির দরজা এমন অবারিত হয়? অনায়াসে বলে দিলেন, সোজা উপরে উঠে যাও। পলিকে দেখতে না পেলেও অসুবিধের কিছু নেই, আমার গ্রন্থ ভাণ্ডারের দরজা খোলাই আছে এখন।

ওঃ। তাই বলুন।

পলির মুখে অভ্যস্ত বিদ্রূপের হাসি, ব্যাপারটা নিজের সুবিধে-জনক হয়ে যাওয়ায় এমন 'উচ্চ প্রশংসা'।

অভ্যস্ত বটে, কিন্তু পলির এ-হাসিতে তেমন ধারাল ছুরির ধার ঝলসে ওঠে?

দেবনাথ বলে, সে তো অবশ্যই, তবে সেটাই সব নয়। ছোটখাটো ঘটনা থেকেই মানুষের অনেকখানি পড়ে ফেলা যায়।

পলির স্বভাবসিদ্ধ ভাষা মুখে এসে যাচ্ছিল—ছাই যায়। ছদ্ম-বেশীদের কিছুই বোঝা যায় না। সব ভেজালের কারবার—

কিন্তু পলি নিজেকে সামলে নিল।...এই সুন্দর সকালটায় নিজেকে কালি মাখাতে ইচ্ছে করল না। পলি তাই মুচকে হেসে বলল, বুদ্ধিমান পাঠকদের কাছে সবই সহজবোধ্য। সে যাক—সেদিন মনে হলো আপনি বুঝি অতঃপর ওই জ্ঞান ভাণ্ডারের ধূলোতেই পড়ে থাকবেন।...কী হলো তারপর?

বলে ফেলেই খুব রাগ ধরে যায় পলির নিজের উপর।...আবার ও যেন ভোঁতা-ভোঁতা কথাই কয়ে ফেলছে পলি। কী হলো তার? এসেই ওই আপনার বাবার মতো হয়না-টয়না বলে পরিস্থিতিটা যেন কেমন জল করে দিল।...ধুরন্ধর আছে। ভেবেছে বাবাকে প্রশংসা করলেই আমি একেবারে—

দেবনাথ অবশ্য পলির এই মনোবৈকল্য ধরতে পারল না, বলল, প্রবল চেষ্টায় লোভ দমন করে-করে বাড়ি বসে থেকেছি। ছুটি চলছিল তবুও—

পলি চোখটা ধারাল করল, তাই না কি? কারণ?

কাবণ আর কি। লোভকে দমন কবাই তো সঙ্গত।

পলি খুব নিরীহগলায় বলে, গেরুয়া ছোপান হয়ে গেছে?

দেবনাথ একটু চমকে তাকায়, তারপব হেসে ওঠে। এ-বাড়িতে কতদিন এমন নির্মল হাসিব ধ্বনি ওঠেনি।...এই লোকটা এ-রকম হাসি হাসতে জানে? কই এতদিন তো—

বলেই ফেলল, না বলে পাবল না। বলল আপনি যে হাসতে জানেন, তা জানতাম না।

আপনিও যে কথা বলতে জানেন, জানতে দিযেছেন কই?

পলি তো বড মুশকিলে পড়ল, কেবলই ভোঁতা কথাব চাষ চলছে যে। কী কবে তবে—

হঠাৎ পলিব মাথায বিগত দিনেব চিন্তাটা খেলে গেল।...তা সেটাই বা মন্দ কী? এখন একটু ঢিলে দিয়ে চলা যাক, আশার ছলনে ভোলানো যাক বাবুকে, তাবপব দেখিয়ে দেওয়া যাবে পলি মুখার্জি কী চীজ।

পলি অতএব ঢিলে দিল, জানতে দেওয়া শক্ত ছিল। যা একখানা জ্যাঠামশাই-জ্যাঠামশাই মুখ কবে থাকতেন। আমি তো মনে-মনে আপনাব নামকবণ কবেছিলাম 'নাক-উঁচু।'

চমৎকাব! খুব সুন্দব! নামকবণেব মৌলিকতা অস্বীকাব করা যায় না।...এখনো নামটা বহাল বেখেছেন?

ঠিক বুঝতে পাবছি না।...পলি হঠাৎ গম্ভিব হয়ে যায়, বলে সর্বদা ছদ্মবেশ আর ভেজালেব কাববার দেখতে-দেখতে মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাস টিশ্বাস নেই।

দেবনাথও গম্ভীর হয, ঠিক এই কথাই মনে হয় আমার আপনাকে দেখে। পৃথিবীর ওপব যেন বিশ্বাস নেই আপনার। এব থেকে ক্ষতি আব কিছু নেই মিস মুখার্জি। পৃথিবীর বিশেষ কিছুই এসে যাবে না তাতে শুধু আপনিই দিনে-দিনে নিঃস্ব হয়ে যাবেন। আপনি ছেলেমানুষ, আপনাব এবকম কেন?

পলি ধিক্কারের গলায় বলে, সবাই যদি আপনার মতো ছেলেমানুষ না হয়, কী করা যাবে? ছেলেমানুষ থাকতে পাওয়াও তো চাই।

আমার কী মনে হয় জানেন, পরিবেশ যেমনই হোক, নিজেকে তার ঊর্ধ্বে ভাসিয়ে রাখবার চেষ্টা করাই উচিত। নিজের জীবনটা তো নিজেরই, তাকে ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করার মানে আছে? চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

পলির মেজাজটা হঠাৎ চড়াৎ করে ওঠে, ক্ষণপূর্বের আলো মুছে যায় মুখ থেকে।...ব্যাপারটা কী? প্ল্যান করে জ্ঞান দিতে এসেছে না কী? তাই মনে হচ্ছে যেন। কী দুঃসাহস! তুই আমায় উচিত বোঝাবার কে রে? তুই জ্ঞান দিতে আসার কে? প্ল্যানটা মুখার্জি সাহেবের নয়তো? লোকে যেমন শত্রু নিপাত করতে গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়, মুখার্জি সাহেব কি তেমনি একখানা গরু লেলিয়ে দিয়েছেন?... ভাবছেন লেলিয়ে দিয়ে যদি কোনমতে মেয়েকে একবার প্রেমে পড়াতে পারি, তো কাজ গুছিয়ে যায়।...ভাল-ভাল বোলচালের জোরে পলি মুখার্জিকে কায়দা করে ফেলতে পারবে এ-ভরসা তাহলে দিয়েছেন এই দেবনাথ সরকারকে। তাই তাঁর সম্বন্ধে এমন অবারিত দ্বার!...

পলি যখন চড়ে ওঠে, তখন পলি যা মনে আসে তাই ভাবে, যা মুখে আসে তাই বলে।...যেই পলির মনে হলো দেবনাথের এই আসাটার পিছনে একটা অভিসন্ধি আছে। সেই পলি চড়ে উঠল, আর সেই মনে-মনে যা খুশি তাই বলতে শুরু করে দিল।...

নিজের স্বভাবে এসে পড়েই পলি তার—হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া ধারাল হাতিয়ারটা খুঁজে পেয়ে যায়, আর সেটার সদ্ব্যবহারও করে বসে। তেতো কড়া গলায় বলে, গেরুয়া তো পরেননি এখুনি গুরুগিরির শখ কেন? ও চেষ্টা ছাড়ুন, এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। বই নিতে এসেছেন নিনগে।...নিয়ে কেটে পড়ুন, ভবিষ্যতে আর পলি মুখার্জিকে জ্ঞান দিতে আসবার চেষ্টা করবেন না।

কথাটা বলে ফেলেই পলি ধরে নিল এই দণ্ডে চলে যাবে লোকটা

বই-টই না নিয়েই। কিন্তু কী আশ্চর্য বেহায়াটার কি মান অপমানের বালাই নেই! এই অবজ্ঞার পরও বলে কিনা—চেষ্টা না করে উপায় কী? অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়াই যে আমার পেশা।

দেবনাথ একটা নামকরা কলেজের লেকচারার। সেই পেশাটারই উল্লেখ করে।

পলি অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। এখনো চালিয়ে যাচ্ছে? পলি ক্ষেপে ওঠে, কড়া গলায় বলে, মুখার্জি সাহেবের কাছে কত ঘুষ খেয়েছেন?

দেবনাথ উত্তেজিত হলো না, একটু হেসে বলল, ঘুষটাত সীক্রেট ব্যাপার, ওটা কি কেউ বলে ফেলে?

উঃ। আপনি তো আচ্ছা নির্লজ্জ।

পলি ফেটে পড়ে, কোন্ লজ্জায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখনো?

নির্লজ্জের আর লজ্জা কী?

দেবনাথ একটা অদ্ভুত কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসে।

'কাল' হাসি!…যে-হাসি দেখে পলি দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।…পলি মাটিতে পা ঠুকে বলে, আপনি যে এত ছোটলোক, তা জানতাম না। যান, বইটই যা নেবার নিয়ে চলে যান বলছি।

দেবনাথ ওর মুখের দিকে হতাশ-হতাশ চোখে তাকায়। যেমন তাকায় একজন ডাক্তার একটা খুব কঠিন রোগীর দিকে।

তবু দেবনাথের মুখে হাসির আভাস।

আচ্ছা যাচ্ছি।…হয়ত আর আসব না। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার বাবা তাতে খুব দুঃখিত হবেন।…আর আর দেখবেন পরে আপনারও এই অকারণ দুর্ব্যবহারের জন্যে দুঃখ হবে।

দেবনাথ নেমে যায়।

লাইব্রেরি ঘরে না ঢুকেই।

আর পলি একটা অভাবনীয় কাজ করে।

পলি সেই ছাদের মেঝেয় বসে পড়ে দু-হাতে নিজের হাত মোচড়াতে থাকে।

একটু পরেই আবার ছটফটিয়ে উঠে পড়ে।...ইঃ!

পরে দুঃখ হবে।...দায় পড়েছে আমার দুঃখ হতে!...তোদের ষড়যন্ত্র আমি ভাঙছি।...মুখার্জি সাহেবের মতলব তো এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ওই বেহায়াটাকে তোয়াজ করে-করে হাত করে ফেলে এখন ওকে দিয়ে আমায় কায়দা করবেন।...ওহে মুখার্জি সাহেব, পলি মুখার্জিকে তুমি এখনো চিনতে পারলে না?...আচ্ছা—চেনাচ্ছি—

পলি নিচে নেমে আসে।

রঞ্জিতমোহন কেমন একরকম ঘাড় গোঁজাভাবে সোফায় বসে কাগজ পড়ছেন।...অথবা পড়ার ভান করছেন।...পলি কোন ভূমিকা না করে সোজা স্পষ্ট গলায় বলে ওঠে, আমি জানতে চাই নয়নতারা কে? জবাব দিন।

রঞ্জিতমোহন চমকে ওঠেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে সোজা হয়ে বসেন।... একবার এই ঔদ্ধত্যের প্রতিমার দিকে স্পষ্টভাবে তাকান, তারপর গম্ভিরগলায় বলেন, এর জবাব হচ্ছে অধিকারের একটা সীমা থাকা উচিত, জানতে চাওয়ারও।

হুঁ!

পলি তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, জানতাম এইরকমই একটা জবাব পাব। জবাব দেবার সাহস না থাকলেই সেটা এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।...তবে মিলি মুখার্জি যে অকারণ তাঁর সাজান সংসার ফেলে দিয়ে চলে যাননি, তা বোঝা যাচ্ছে, আর আপনারও মতলব বোঝা গেছে।

আমার মতলব!

এইটুকুই শুধু বললেন রঞ্জিতমোহন।

হ্যাঁ। হ্যাঁ মতলব।...পলির অসহিষ্ণু গলা উচ্চকিত হয়ে ওঠে, আপনার প্ল্যান ধরে ফেলবার মতো বুদ্ধি আমার আছে।... বাড়িটাকে নিষ্কণ্টক করে ফেলে সেই নয়নতারাকে—

অসভ্যতা থামাও পলি—

ধমকে ওঠেন রঞ্জিতমোহন।

যা শুনে বাড়ির অন্য প্রান্ত থেকেও লোকজনেরা চমকে ওঠে। সাহেবের গলা থেকে এমন জোর ধমক। তাও মিস সাহেবকে। তাজ্জব।

তাজ্জব হয়ত পলিও হলো। তবু গোঁয়ারের মতো ভাবল, হুঁ ধরা পড়ে গিয়ে এখন ভাবছেন ধমক মেরে ঠাণ্ডা করে দেবেন। অত নয়। কী করবে তুমি আমার? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে? দাও না। যা ইচ্ছে করে বেড়িয়ে তোমারই মুখ পোড়াব।...

অতএব পলি অদম্য গলায় বলে, ধমকে চুপ করাতে পারবেন না আমার। ড্রাইভারকে না নিয়ে অনেকক্ষণের জন্য একা কোথায় যান?...যান কি-না? অস্বীকার করতে পারেন?

রঞ্জিতমোহন হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, স্থির-গলায় বলেন, অস্বীকার করতে যাবই বা কেন?... প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু ব্যাপার থাকতে পারে। তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয় সে। দেখে আশ্চর্য লাগছে, তুমি আমার কাছে—কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছ! এটা হচ্ছে অধিকারের সীমা লঙ্ঘন।...

জানি।

পলি ঠোঁট কুঁচকে বলে, এই উত্তরই দেবেন আমি জানতাম ঠিক আছে, আমি বার করে ছাড়বই, কোথায় আপনি যান হঠাৎ-হঠাৎ আর যাকে মনিঅর্ডার পাঠান, সে কে!

রঞ্জিতমোহন মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্থির গলায় বলেন, ঠিক আছে, তোমায় আর কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে না, চল, আজই দেখিয়ে আনব—কোথায় যাই মাঝে-মাঝে, আর কে নয়নতারা।

পলি এঃ স্পষ্ট কবুলে একটু থতমত খায়, কিন্তু পর মুহূর্তেই হি হি করে হেসে ওঠে, আপনি নিজে দেখিয়ে আনবেন?...আপনি তো ইচ্ছে করলেই একখানা মন্দির-টন্দির দেখিয়ে দিয়ে বলতে পারেন 'এই যে এইখানে আসি আমি।' আর—

রঞ্জিতমোহন গম্ভির গলায় বলেন, তাহলে যেও না। আমার

সম্পর্কে যখন এতদূর সন্দেহ করতে পারছ, তখন বুঝতেই পারছি আর আশা করার কিছু নেই। তোমারও তোমার মায়ের মতো জীবনে কখনো সুখী হবার ক্ষমতা থাকবে না।

পলি এক মিনিট ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্যদিন হলে হয়ত সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠত, আপনি তো দেখছি ভবিষ্যদ্বাণী-টানীও করতে শিখে গেছেন। আজ বলল না।·· দাঁড়িয়ে থেকে ঝপ করে বলে উঠল, আচ্ছা চলুন।

রঞ্জিত নিজেই গাড়ি বার করলেন। ড্রাইভারকে হাত নেড়ে বারণ করলেন।

পলি ঠিক করে নিয়েছে কোন্‌দিকে যাচ্ছি, জায়গাটা কী কিছু জিগ্যেস করবে না, শুধু পথের দু-পাশ অবলোকন করতে-করতে বুঝে নেবে, কিন্তু পলি কি এ-রকম পথে কখন এসেছে?···

প্রথমটা দেখছিল গাড়ি ব্যাণ্ডেলের দিকে এগিয়ে চলেছে, তারপর যে কোন্‌দিকে বাঁক নিল, কীরকম একটা গ্রামের পথে ঢুকে পড়ল, আর জায়গা সম্বন্ধে আন্দাজ রইল না।···গ্রামের পথ এবড়ো-খেবড়ো, পুকুর আর ডোবার সরু কিনারা ঘেঁষে-ঘেঁষে অবশেষে গন্তব্যস্থল। খানিকটা পোড়ো জমির সামনে গাড়িটা থামালেন রঞ্জিতমোহন, বললেন, মাঠটা হেঁটে পার হতে হবে।

পলি বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

জমিটা রাজ্যের জঞ্জালে বোঝাই। পাড়াসুদ্ধ লোকের এইটাই বোধহয় ওঁচলা ফেলার জায়গা। উনুনের ছাই, ছেঁড়া-ন্যাকড়া-কাগজ, ভাঙা মাটির হাঁড়ি ইত্যাদির স্তূপ।···পলি বলল, আমি কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছি আপনার চেষ্টা দেখে।

পলি, গাড়িতে তোমায় একটা প্রমিস করিয়ে এনেছি, ভুলে যেও না।

হ্যাঁ বলেছেন—কোনো রিমার্ক করব না।

এগোতে থাকেন রঞ্জিতমোহন। মাঠটা পার হয়ে সামনের বাড়িখানা পর্যন্ত এগিয়ে যান। অগত্যা পলিও নাকে রুমাল চাপে।

ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি, সামনে একফালি রোয়াক, সেই রোয়াকে উঠে বন্ধ দরজার শিকলটা নাড়েন রঞ্জিতমোহন, মিনিট খানেক পরেই দরজাটা খুলে যায়, আর পশ্চাৎবর্তিনী পলির কানে একটি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত স্বরে ভেসে আসে, ছোড়দা তুমি। হঠাৎ আজ! এ-সময়!

ছোড়দা! তুমি!

পলি মনে-মনে ভেবে নেয় 'দাদা' পাতানই তো সব থেকে নিরাপদ। কিন্তু ভাবা যায় মুখার্জি সাহেবের এই রুচি। আচ্ছা কেনই বা? ইচ্ছে করলেই তো উনি ওঁর প্রিয় পাত্রীর জন্য ভাল ব্যবস্থা করতে পারতেন। সভ্যভব্য ফ্লাট,···কী জানি, হয়ত লোক জানাজানি হবার ভয়ে।...বয়সের থেকে অনেক বেশি পাকা পলি ভাবে, এই গোপন গর্তে অন্তত কেউ রঞ্জিত মুখার্জিকে খুঁজতে আসবে না।···চালাকি বটে একখানা।

তবু ছি-ছি না করে পারে না পলি।

উঠে এস—

বাপের ডাকে পলি বলে ওঠে, এখানেই দাঁড়াচ্ছি, আপনি আপনার কাজ সেরে আসুন।

রঞ্জিতমোহন গম্ভির গলায় বলেন, আমার তো কোনো কাজ নেই। তোমাকে নিয়ে আসাই কাজ ছিল।

এখন সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী বেরিয়ে আসেন। উৎফুল্ল গলায় বলে ওঠেন, উঃ ছোড়দা গো, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। তোমার [illegible] পুজো করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কতদিনের সাধ ছিল, ভেবেছিলাম, কখনো যদি এই দিক দিয়ে কোথাও যাও, অচেনা হয়ে দূরে থেকে এব [illegible] দেখব।···এস মা জননী ভেতরে এস, মা লক্ষ্মীকেও কখনো-কখনো কুঁড়ে ঘরে পা ফেলতে হয় গো। এস ছোড়দা!

কী সপ্রতিভ! কী ঝরঝরে কথা!···ঘরটাও তো ঠিক ধারণা অনুযায়ী নয়। বাড়ির বাইরেটা যতই দীনহীন হোক, যে-ঘরে ঢুকল ওরা, তার ভিতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম।···এটাকেই

বসবার ঘর বলতে হবে, তবে বসবার জন্য একখানা সরু কাঠের চৌকি, আর দু-তিনটি সস্তা বেতের মোড়া ছাড়া আর কিছুই নেই।

তবু যেন রয়েছে কিছু।

বোঝা যাচ্ছে না কোথায় সেই 'কিছুটা'!

চৌকির উপর পাতা শ্রীনিকেতনী চাদরখানায়, না ঘরের এক কোণায় রাখা ছোট্ট টেবিলটার উপর বসান শাদা পাথরে ছোট্ট একটি বুদ্ধ মূর্তিব সঙ্গে ছোট মাটির ঘটের মধ্যে রাখা গুটি কয়েক কাঠচাঁপা ফুলে না-কি এদিকের দেয়ালের ধারে রাখা বোধ করি কেরোসিন কাঠের একটা নিচু র‍্যাকে সাজান বই কখানার মধ্যে অথবা দেয়ালে ঝোলান দাঁড়ান ববীন্দ্রনাথের।···

ধরা যাচ্ছে না কোথায় রয়েছে সেই অদৃশ্য 'কিছুটা' হয়ত বা সবটা মিলিয়েই। নইলে দেয়ালগুলো নিরীক্ষণ করলেই তো চোখে পড়বে নোনা-ধরা বালি-ঝরা।···তবু বলা যায় বাইরেটা দেখে ভিতরের চেহারাটা অনুমান করতে পারেনি পলি।

ঘরের ভিতরের দরজায় একটা পুরনো নীল-রঙা শাড়ি থেকে বানানো পর্দা ঝুলছে। ঝুলন্ত তবে উড়ন্ত। দেখা যাচ্ছে ভিতরেও একটা সরু দাওয়া—তার ওধারে আর একটা ঘর। সেও হয়ত এইটার মতোই ছোট অথবা আরো ছোট। সেই ঘর থেকে একটা পুরুষের ক্ষীণ স্বর ভেসে এল।

এই দেখছ তো ছোড়দাদা?

মহিলাটি হাসেন, তোমার গলার সাড়া পেয়ে অস্থির হচ্ছে ভাবছে বোধহয় ভাইবোনে এ ঘরে জমে গেল কেন।···বলে আসি ভিখিরির ঘরে আজ চাঁদের উদয়, সাত রাজার ধন এক মানিকের আবির্ভাব। কী সুন্দরী হয়েছে তোমার মেয়ে গো ছোড়দা।

রঞ্জিতমোহন একটু হেসে বলেন, আমার বাবার মেয়েও কম সুন্দরী ছিল না—

কী যে বল! কিসে আর কিসে—আচ্ছা আসছি—বলে মহিলাটি ওঘরে চলে যান।

পলি সেইদিকে তাকিয়ে অবাক আর অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে থাকে, এই মহিলাটিকে কোথায় দেখেছি আমি। জীবনে তো কখনো এমন পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় নেই আমার। এই বাড়িটায় ঢুকবার সময় স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পলি এখানের কোনো বাসিন্দাকে সে মনে-মনেও 'মহিলা' বলে ভাববে।...

কিন্তু এত পরিচিত কেন লাগছে।

এই 'নয়নতারা'!

ঘরের স্তব্ধতাকে যেন চিরে দিয়ে শব্দটা উঠল।

রঞ্জিতমোহন গভীর গলায় বললেন, এই তোমার প্রশ্নের উত্তর।

পলি আবার যেন তার সব ধার হারিয়ে ফেলে, আর সেই ধার হারান পলি বোকার মতো বলে ওঠে, আমি এঁকে আগে দেখেছি।

রঞ্জিতমোহন শান্ত একটু হাসেন, নাঃ এঁকে দেখবার সুযোগ অথবা দুর্যোগ তোমার কখনো আসেনি—

কিন্তু আমার যেন খুব দেখা-দেখা—

রঞ্জিতমোহন বলেন, তার কারণ তুমি আমায় দেখেছ। আমার পিঠোপিঠি ছোটবোন এই টুটুর আমার সঙ্গে মুখের আশ্চর্য রকমের মিল। ছেলেবেলায় অনেকে আমাদের যমজ ভাবত।

তোমার পিঠোপিঠি বোন!

পলি কি হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল? পলি তাই অনেকদিন আগের মতো বাপকে 'তুমি' করে কথা বলল অন্তরঙ্গতার সুরে। অথবা আত্মবিস্মৃতিরই সুরে।

হ্যাঁ, দারুন পিঠোপিঠি—

রঞ্জিতমোহন বলেন, মাত্র দেড় বছরের ছোটবড়। ওর সঙ্গে আমার ছিল যত ঝগড়া, তত ভাব।

পলি একটু চুপ করে থেকে আস্তে বলে, তোমার ওইরকম কোন এক বোন যেন জলে ডুবে না কী করে মারা গিয়েছিল।

ছেলেবেলার স্মৃতি মন্থন করে কথাটা বলে পলি।

অনেক অনেকদিন আগে যখন 'পলি' নামের একটা ছোট্ট ফুটফুটে

মেয়ে 'বাপি গপ্‌পো বল, বাপি গপ্‌পো বল' বলে গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ত, তখন তার বাপি আবোল-তাবোল অনেক গল্পর সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার গল্পও বলত।...যে-ছেলেবেলায় বস্তুজগতের অনেক কিছু অভাব থাকলেও আনন্দের অভাব ছিল না। আর যে ছেলেবেলাটার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকত তার 'টুটু' নামের একটা পিঠোপিঠি ছোটবোন।...

সেই টুটুর সঙ্গেই পলির বাপির যত খেলা, যত বিদ্‌ঘুটে খেলা আবিষ্কারের পরামর্শ, যত হুটোপাটি; যত দৌরাত্ম্য যত ভাব তত আড়ি।...তিনবার 'গাড়ি গাড়ি গাড়ি' বললেই আড়ি হয়ে যায়। আর তিনবার 'ডাব ডাব' উচ্চারণ করে ফেললেই যে সেই আড়িটা ভাব হয়ে যায়, একথা শুনে পলি হেসে কুটি-কুটি হতো, আর সেই নতুন শেখা ব্যাপারটা বাপির সঙ্গেই চালাতে চেষ্টা করত।...তবে মায়ের আড়ালে, মা ওসব গাঁইয়া খেলা ভালবাসত না।

সেই টুটুর গল্প শুনতে খুব উৎসাহ ছিল পলির, কারণ পলির বাবা বলত, টুটু ছোট্ট বেলায় ঠিক পলির মতো দেখতে ছিল, টুটু ভীষণ দুরন্ত ছিল বলে সবাইর কাছে বকুনি খেত (বাদে ছোড়দা), আর টুটু গল্প শুনতে দারুণ ভালবাসত।

তারপর?

পলির গল্প-শোনা মন কোনোখানে থামতে চায় না, তাই 'তারপর' এরও শেষ হয় না, তাই 'টুটু' প্রসঙ্গে ছেদ পড়তে চায় না।... টুটু ইস্কুলে ফার্স্ট হতো, টুটু, প্রাইজের দিনে নাচগান করে আবার নতুন প্রাইজ পেত, টুটু ছোড়দার বই খাতা গুছিয়ে রাখত,...টুটু 'ঘর ঝাড়া' 'পান সাজা' রুটি বেলা' ইত্যাদি অভিনব সব কাজ করত,...টুটু কবিতা লিখত।

তারপর? ও বাপি তারপর?

তারপর? তারপর টুটু একদিন হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল?

দারুন রেগে গিয়েছিল পলি, হারিয়ে গেল ! তোমরা খুঁজে আনলে না ?

কী করে খুঁজে আনব ? বিচ্ছিরি একটা দৈত্য ধরে নিয়ে গেল যে —

দৈত্যকে মেরে ফেলতে পারলে না ?

সে যে মাযাবী দৈত্য। টুটু তার কাছ থেকে আসতেই চাইবে না।

দৈত্যকে মেবে ফেললে টুটুও মরে যাবে।

তারপর ?

তারপরও আর কিছু থাকে না কি ?

আর একটু বড় হয়ে পলি শুনেছিল, তাব বাপির দু'জন বড়-বড় দিদি যেন কোন্ পচা-পচা গ্রামে থাকে, পলির বাপির একজন দাদা নাকি ভীষণ জ্বর হয়ে মারা গিয়েছে, আর পলির বাপির সেই টুটু একদিন নাকি কোথাকার কোন্ একটা ময়লা পুকুরের জলে ডুবে মারা পড়েছে।

পলির মা, এইসব তথ্য শুনতে ভাল বাসতেন না, ভাল বাসতেন না ছোট্ট পলির সুন্দর মনের মধ্যে এইসব দুঃখের আর ভয়েব গল্প ঢোকান।...'গল্প'ই বলতেন।...তা গল্পই তো। যা অতীত, তার প্রসঙ্গই তো 'গল্প'।

সেই গল্প মনে পড়ে গেল পলির।

তাই বাপির সেই এক ছোটবোনের জলে ডুবে যাওয়ার কথাটা বলল। রঞ্জিতমোহন বললেন, সেই কথাই প্রচাব করা হয়েছিল। অত সুন্দর মেয়েটা যদি একটা গ্রামে মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সেই মাসির পাড়ার একটা মুখ্য কালো বিচ্ছিরি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তাকে তো জলে ডুবে যাওয়াই বলে।

পালিয়ে—

পলি তাকিয়ে থাকে।

রঞ্জিতমোহন বলেন, তাই তো ঘটে থাকে পলি। পরিবেশের

প্রতিকূলতা যখন কাউকে প্রার্থিত বস্তু পেতে বাধা দেয়, তখন সে মরিয়া হয়ে উঠে পালিয়ে গিয়েই সেটা পাবার চেষ্টা করে।

পলি বাপের মুখের দিকে তাকায়। এ-কথাটা কি রঞ্জিতমোহন শুধুই তাঁর পিঠোপিঠি ছোটবোনের ব্যাপারেই বললেন? আর কারো কথা কি নিহিত আছে এর মধ্যে?

অধিক ভাববার সময় হলো না, ও-ঘর থেকে মহিলাটি চলে এলেন। বলে উঠলেন, পাগল মানুষের আবদার শোন ছোড়দা, বলে তোমার ভাইঝিকে দেখব।...এতক্ষণ ধবে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে—

রঞ্জিতমোহন আস্তে বলেন, দেখলেই বা ক্ষতি কী? পলি'ও তো দেখতেই এসেছে।...ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাই আমি তাই দেখতে, 'নয়নতারা দেবী' যে কে তা দেখতে।

মহিলাটি একটু হাসেন, বলেন; বলতেই হবে তোমার মেয়ে তোমায় বেশি ভালবাসে, তাই তোমার সবটা জানতে চায়।...কিন্তু বহুকাল আগে মরে গিয়ে পেত্নী হয়ে যাওয়া একটা মেয়েকে তুমি দেখতে আস, আর তারই পেত্নীবেলার নাম 'নয়নতারা' এটা তো আর বলার মতো কথা নয়। তা যাক্ একটা পেত্নী দেখে ওর কী লাভ হলো জানি না, পেত্নীটার কিন্তু একটা পরী দেখে নয়ন সার্থক হলো।...

এতক্ষণে মহিলাটির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে পলি। সত্যিই বটে রঞ্জিত মুখার্জির মুখের সঙ্গে আশ্চর্য মিল ওঁর মুখের।...ভাবের ব্যঞ্জনার আদলের। সম্পর্কটায় সন্দেহের প্রশ্ন আসছে না।

পরনে একখানা মাঝারি চওড়া পাড়ের পরিষ্কার শাদা শাড়ি, গায়ে অতি সাধারণ একটা শাদা ব্লাউজ, হাতে একগাছা করে মোটা লাল রঙের বালা, এই বালা কিসের তা বুঝতে পারে না পলি।... কপালে টিপের বালাই নেই, সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা রয়েছে।

গায়ের রং যে একদা রীতিমতো ফরশা ছিল, তা এখন এই জ্বলে যাওয়া চামড়া থেকেও ধরা পড়ছে। আর এক ধরা পড়ছে সবটা মিলিয়ে একটা মার্জিত ছাপ।...অনেক সাজসজ্জার সমারোহের মধ্যে প্রায়শঃই যেটা হারিয়ে যায়।

হঠাৎ পলি খাড়া হয়ে বসে। বলে ওঠে, এতদিন ধরে লুকিয়ে থাকবার কী মানে ছিল?

রঞ্জিতমোহন চমকে ওঠেন।

অকস্মাৎ এমন স্পষ্ট গলায় কথা বলে উঠবে পলি, ধারণা ছিল না।

নয়নতারা তা পেত্নীবেলার নাম বলা যাক টুটু। আসলে চমকে ওঠে। তারপরই বলে, যাক বাবা, গলাটা শুনলাম তোমার। আসলে কী জান? মরে যাওয়ার পর আবার বেঁচে উঠতে চাইলেও সমাজ-সংসারের লোকেরা বেঁচে উঠতে দিতে রাজি হয় না, চেষ্টা করতে যাওয়া বোকামি, তাই যমালয়েই পড়ে রইলাম। মরেই যখন গিয়েছি।

তারপর সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে আসে টুটু, ছোড়দা এমনিতে তুমি যখনই আস মিষ্টি নিয়ে আস, আর আজ মেয়েকে নিয়ে এলে শুধু হাতে? কী দিই বল তো ওকে?

পলি সবেগে বলে কিছু দিতে হবে না, আমি মিষ্টি খাই না।

খেলেও তো দিতে পারছি না। চা খাও?

খাই, এখন খাব না।

আচ্ছা থাক! তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করবে, এমন অবস্থা তো এবাড়ির নয়ও। কিন্তু ছোড়দা তোমাকে তো চা খেতেই হবে।

রঞ্জিতমোহন চৌকিতে পড়ে-থাকা একখানা বই উল্টোতে-উল্টোতে বলেন, খাব না, এমন কথা বললাম কখন!

টুটু হেসে ফেলে।

বলে, বললেও ছাড়া হতো না, আর একজন·· তোমার অনারে আর একবার পাবে আশায় প্রায় উঠে বসে আর কী।

পলির দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার পিসেমশাইর প্যারালিসিস তো, ওঠবার ক্ষমতা নেই। ছোড়দা এলে উৎসাহে উঠে বসতে চায়, দেবতার মতো দেখে।

পলি নামের মেয়েটার সর্বদা টগ্‌বগিয়ে ফুটতে থাকা রক্তটা কি এই উল্টো-পাল্টা জায়গায় এসে হঠাৎ ঝিমিয়ে গেল? নইলে এই

কথার সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল না তা তো দেখবেনই। মাসে-মাসে ভালমতো একখানি বড় মনিঅর্ডার এলে প্রেরককে 'দেবতা' না দেখলেই তা অকৃতজ্ঞতা।

এখানে আসার আগে পর্যন্ত এ-রকম কথা পড়লে তাই ভাবত তো পলি। এখানে এসে পলি যেন বোকা বনে গেছে।

পলি শুধু ভেবে চলেছে, রঞ্জিতমোহন যদি এই সহজ সম্বন্ধটা প্রকাশই করতেন, তাহলে কী লোকসান ছিল? প্রকাশ না করার জন্যে তো কত-কত লোকসান হয়ে গেল। কী যুক্তি ছিল প্রকাশ না করার?

রঞ্জিতমোহন চা খেলেন, ও ঘরে গিয়ে সেই কার সঙ্গে দেখা করে এলেন, তারপর বললেন এইবার তো যেতে হয়।

আর একটু ছোড়দা, আর একটু—

টুটু বলে ওঠে, আর তো তুমি ওকে নিয়ে আসছ না, আর একটু দেখি। আচ্ছা ছোড়দা আমাদের মায়ের যে একটা কাদের সঙ্গে যেন গ্রুপ ফটো ছিল, সেটা আছে তোমার কাছে?

আমার কাছে!

রঞ্জিতমোহন একটু হাসলেন, পুরনো কালের কিছুই আমার কাছে নেই রে। আমিও তোরই মতো একটা মৃতব্যক্তি। কিন্তু কেন? ছবির কথা কেন?

এমনি হঠাৎ মনে হচ্ছে, তোমার মেয়ের মুখে ঠিক মায়ের মুখের ছাপ।

ধ্যেৎ। ও ওর মার মতো।

মাকে দেখিনি হয়ত সবটাই তাই, তবু মায়ের সঙ্গে কোথায় যেন খুব মিল একটা আছে। কপালের, ঠোঁটের, মাও তো সুন্দরীই ছিলেন।

তোর সে-ছবির আদল মনে আছে না কি এখনো?

টুটু একটু হাসে।

সেই হাসির মধ্যে অনেক কথা ব্যক্ত হয়।

আবার বলে টুটু, নাঃ তোমার মেয়ের মুখে আছেই বাপু ঠাকুমার ছাপ। যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে। যাক তোমার শ্বশুর কেমন আছেন?

রঞ্জিতমোহন চকিত হয়ে আস্তে বলেন, অমনি একরকম।

পলি শুনে অবাক হয়।

রঞ্জিতমোহন আবার তাঁর শ্বশুরের খবর রাখছেন কখন?

টুটু বলে, তার চাইতে বাবা বুড়ো ভদ্রলোককে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেই রাখ না। কেবল কেবলই তাহলে তোমার বউকে সংসারপত্তর ছেড়ে চলে যেতে হয় না। অথচ বাবা বলে কথা একমাত্র সন্তান—

ওঃ বোঝা গেছে।

পলি মনে-মনে বলে, এখানেও সেই লুকোচুরি, সেই মিথ্যের জাল। প্রকৃত ঘটনা অজানিত। ভাবল, তবু একটু কৃতজ্ঞ না হয়েও পারল না। বোঝা যাচ্ছে রঞ্জিতমোহন তাঁর আদরের বোনের কাছে সব গল্প করে স্ত্রীকে খেলো করে রাখেননি

রাপি!

রঞ্জিত চমকে ওঠেন।

রঞ্জিতমোহনের মনে হয় কত কতকাল পরে যেন বড় প্রিয় আর মধুর একটা হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীত ধ্বনি শুনতে পেলেন।

রঞ্জিতমোহনের কান থেকে প্রাণ পর্যন্ত যেন একটা সুখের স্পর্শ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে নিয়ে কিছু বললেন না রঞ্জিতমোহন, শুধু বললেন কী রে?

তবু খুব কি সহজ হতে পারলেন?

গলাটা কেঁপে গেল না?

পলি বলল, আমি ওঁকে দেখব?

ওঁকে।…অর্থাৎ পাশের ঘরের সেই উত্থান-শক্তি-রহিত লোকটাকে।…পলির চোখের গতিবিধি সেই কথাই বলল।

দেখবে?

হ্যাঁ।

খুব রুগ্ন-টুগ্ন আর কী।

রঞ্জিতমোহন একটু ইতস্তত করেন, তাছাড়া ঘরটা ইয়ে—

তা হোক—

পলির কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

হ্যাঁ পলি দেখতে চায়। কী সেই বস্তু, যারজন্যে একদা টুটু নামের মেয়েটা সমাজ সংসার থেকে মুছে গিয়ে 'পেত্নী'তে পরিণত হয়েও এখন এমন তাজা থাকতে পেরেছে। না দেখে যাবে না পলি।

দেখেই পালিয়ে আসে পলি।

কয়েক সেকেণ্ডের বেশি দাঁড়ান যায় না ও-ঘরে।···

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডেই দেখা হয়ে গেছে পলির।

যা দেখবার দেখা হয়ে গেছে।···কয়েক পলক একটা কুশ্রী কঙ্কালসার শয্যাগত দেহের দিকে তাকিয়ে দেখে পলির সমস্ত চেতনা, সমস্ত অনুভূতি যেন প্রবল আলোড়নে আলোড়িত হয়ে পলিকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিতে চাইছে।

পলি কি এখন ভয়ানক ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে? পলি তার বাবার পিঠোপিঠি বোনের রুচির পরিচয় পেয়ে ধিক্কারে বাবার গায়েই ধুলো দেবে?

কই তা তো করল না পলি।

পলি একটা অদ্ভুত সম্মোহিত অবস্থায় গিয়ে গাড়িতে উঠল। আর অনেকক্ষণ গাড়ি চলার পর আস্তে বলল, মাকে যদি কোনোদিন নিয়ে আসতে!

পলি একটা অন্য অবস্থায় রয়েছে তাহলে।

পলি, মিসেস মিলি মুখার্জি বলল না, বলল, 'মা'। মাকে—

রঞ্জিতমোহন গাড়ি চালাতে-চালাতে তেমনি গভীর স্বরেই বলেন, আনা যেত না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম টুটুর কাছে পরিচয় প্রকাশ করব না। মৃতের খাতায় যার নাম উঠে গেছে, সে মৃতই থাক।

তাহলে আজ?

তোমার সম্পর্কে ওর বড় আকুলতা ছিল, বল তো বাবার বংশের আর কাউকে তো কখনো দেখতে পাব না—

আরো যারা সব আছে তোমার, তারা কেউ আসে না?

পাগল। তারা জানেই না-কি তাদের মরা বোনটা এখন পৃথিবীর বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

অথচ তুমি চিরকাল—

চিরকাল নয় বলি, কিছুকাল।…কিছুকাল আগে হঠাৎই একদিন দেখতে পেলাম।…কোম্পানির কাজে আসানসোল যাচ্ছি, হঠাৎ এই-খানেরই কাছাকাছি একটা মরাপচা দাতব্যের ডিসপেনসারির সামনে—

একটু থামলেন রঞ্জিতমোহন, গলা ঝেড়ে বললেন, ওষুধের জন্যে লাইন দিচ্ছে।: নেমে পড়লাম, ধরে ফেললাম, প্রথমটা তো মানতেই চায় না, বলে আপনি লোক ভুল করছেন, তারপর কেঁদে ফেলল।

পলি বলে, তার মানে তখন থেকেই ওঁর, মানে ওই ভদ্রলোকের অসুখ।

তখন থেকে ?

রঞ্জিতমোহন একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসেন, যখন, আমি চলে যাচ্ছি—ভেবো টুটু মরে গেছে, তখন থেকে।

তখন থেকে! মানে—

তাইতো বল।। ছেলেটা নাকি বলেছিল জন্মাবধি হাঁপানি আছে, সেকথা গ্রাহ্য করেনি টুটু।·· সাধে কি আর বাবা তাঁর সব ছোট আর সবচেয়ে আদরের মেয়েটাকে জ্যান্ত অবস্থায় 'মৃত' বলে ঘোষণা করেছিলেন।…তিনকুলে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি পড়ে থাকা—হাড়কুশ্রী মুখ্যু একটা ছেলে তাও রোগগ্রস্ত—

রঞ্জিত একটু থেমে একটু ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে বললেন, আর দেখনি তো পিসিকে! যে-কোন বাপের পক্ষেই সহ্য করা শক্ত বৈকি!

আচ্ছা উনি তো মানে ওই টুটু লেখাপড়া করেছিলেন'?

ক্লাশ টেনে পড়ছিল। তখনই তো পালাল। কী যে ঘটল। কী দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, সে-কথা বলতে রাজি না হলেও বুঝতে তা পেরেছিলাম। সেই থেকেই আর কি—ওকে দেখা-টোখা।

গাড়ির সামনে একটা গরু আসছিল তাড়াতাড়ি ব্রেক কষলেন রঞ্জিতমোহন।

খানিকক্ষণ পরে আস্তে বললেন, কী অপাত্রে কী অদ্ভুত ভালবাসা। সর্বস্ব ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে—

ভালবাসা! ভালবাসা।

কী সেই জিনিস, যার জন্যে সর্বস্ব ছাড়া যায়। সবাইকে ছাড়া যায়। যার জন্যে মৃতের খাতায় নাম লেখান যায়।...যে ভালবাসায় প্রেমপাত্রের রূপ-গুণ-বিদ্যা-স্বাস্থ্য-অর্থ-অবস্থা কোন কিছুই বিচারের মাপকাঠিতে ফেলার কথা মনে আসে না। আর যে ভালবাসায় সারাজীবন একটা দুর্বহ ভার বয়ে-বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়।

কী সেই অনুভূতি?

কী তার স্বাদ?

পলি জানে না, পলির কাছে ওটা এক অজানিত রহস্য। পলি কখনো ভালবাসেনি মাকে নয়, বাবাকে নয়, বন্ধুকে নয়, কাউকে নয়। পলি যেন মরুভূমির গাছ। ফুলহীন পাতাহীন শুধু কাঁটার সম্বল।

পলি ভালবাসতে জানে না।

পলির ভীষণ ইচ্ছে করছে ভালবাসতে।

খুব ভালবাসতে।

ভালবাসার দায়ে সর্বস্ব ছাড়তে। ভালবাসায় মরে যেতে।

পলি পিছিয়ে পিছিয়ে অতীতে চলে গিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে, সেখানে টুটু নামের একটা উজ্জ্বল মেয়ের ভালবাসার ঐশ্বর্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পলির টুটু হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।...পলির তীব্র বাসনা হচ্ছে—সেই চিঠিটা লিখে রেখে চলে যেতে, যে-চিঠিতে লেখা থাকবে—'মনে ভেবো পলি মরে গেছে।'

পলি এই রোমাঞ্চময় সুখটাকে মনের মধ্যে লালন করে যেন তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে থাকে...খুব গরিব আর মুখ্যু একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে পলি। অনেক দুর্দশার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে চলতে হচ্ছে। টাকা পয়সার অভাবে কত কতদিন খেতে পাচ্ছে না, ছেঁড়া জামা-কাপড় পরছে...জানা-অজানা আরো সব দুর্দশার ছবি মনে-মনে আঁকতে থাকে পলি, আর কল্পনা করতে থাকে

তবু ভীষণ সুখে আছে পলি নামের মেয়েটা। কারণ সে ভালবাসার মধ্যে ডুবে আছে, ভালবাসার শক্তিতে অবস্থার সঙ্গে লড়ছে।

'গরিব হয়ে হয়ে যাওয়া' পলি কল্পনার প্রবল দৌড়েও কিন্তু পরিবেশটাকে ঠিক গড়ে তুলতে পারছে না, বারে-বারে চোখের সামনে যেটা ভেসে উঠছে, সেটা হচ্ছে একটা জঞ্জাল-ঝোঝাই পোড়ো জমির পথ ধরে গিয়ে পৌঁছে যাওয়া ছোট্ট একতলা বাড়ি, যে-বাড়ির মধ্যে ঢুকলেই সেই ঘরখানা পাওয়া যাবে। যে-ঘরের দেয়ালের ধারে শ্রীনিকেতনী চাদর পাতা একটা সরু চৌকি, সস্তা কটা বেতের মোড়া, টেবিলে শ্বেতপাথরের ছোট্ট বুদ্ধমূর্তি। দেয়ালে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ। আর অন্য দেয়ালটার ধারে কয়েকখানা মাত্র বই সাজিয়ে রাখা একটা বাজে কাঠের র‍্যাক।···পলির বাবার লাইব্রেরি ঘরটা যেন কখনো চোখে দেখেনি পলি।

পলি সেই বাড়িতে আর একটা মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি বসে খুব দীন-দুঃখীর মতো খাওয়া খাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না সেই বাসাটা কী রকম জায়গায়।

কিরকম টেবিল? কিরকম চেয়ার? কেমন বা ডিশ-প্লেট থালা? কল্পনাটা ঝাপসা-ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, যেটাকে খুব স্পষ্ট করে আঁকতে পারছে পলি, সেটা হচ্ছে—লাল লাল মোটা চালের ভাত, বিচ্ছিরি একটা তরকারি আর কিছু না।

এই ছবিটা আঁকতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে পলি, অবশ্য ওই ভাতটা কিভাবে সামনে এসে হাজির হচ্ছে, সেটা পলির হিসেবের মধ্যে থাকছে না, তবে তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না, ভাতগুলো তো যথেষ্ট পরিমাণে লাল আর মোটা।

কিন্তু যার সঙ্গে পাশাপাশি বসে ওই অন্ন অমৃততুল্য করে খাচ্ছে পলি, সে কি যা-হোক তা-হোক একটা গরিব আর মুখ্যু ছেলে? কালো রোগা বিচ্ছিরি!

বারে-বারে তো তার বিপরীতই একটা চেহারা হাসিহাসি মুখে তাকাচ্ছে পলির দিকে।

আচ্ছা পলির আকাশটা আজ এত আলোয় ভরে উঠল কেন? পলি বাতাসে এমন প্রাণের স্পর্শ পাচ্ছে কেন? পলির বুকের মধ্যেকার ভয়ঙ্কর একটা ভার নেমে গেছে কেন? সে কি পলির মুখে তার ঠাকুমার মুখের স্পষ্ট আদল, শুধু এই খবরটুকু জেনে?

এই খবরটুকুর মধ্যে জমা ছিল এত মুক্তি?

এখন কি পলি নিভৃতে মুখার্জি সাহেবের ফটোর সঙ্গে নিজের মুখ মিলিয়ে দেখবার সাহস খুঁজে পাবে আরশির পাশে দাঁড়িয়ে?

'নয়নতারা', এই নামটা নাকি তোমার পেত্নীবেলার নাম, তা হোক তবু ওই নামটাকে আমি পুজো করব। তুমি আমার মুখের গড়নে তোমার মায়ের মুখের আদল খুঁজে পেয়েছ।

ভাগ্যি আমি তোমার কাছে এলাম নয়নতারা!

আর অহরহ নিজেকে নিজে প্রশ্নে-প্রশ্নে ক্ষত-বিক্ষত করতে হবে না। আমি তবে কে? আমি তবে কে?

পলির প্রাণের মধ্যে শান্তির পারাবার। পলি যেন তাতে অবগাহন করে উঠল। পলির সমস্তটা জুড়ে কাদামাখা ছিল, ধুয়ে গেল সেই কাদা।

তবু পলি সর্বস্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার ছবিটাকে ছাড়ছে না, কারণ পলি ভালবাসায় মরে যেতে চাইছে। এই অজানিত স্বাদটাকে মনের মধ্যে লালন করতে-করতে পলি হঠাৎ মিলি মুখার্জিকে দেখতে পেল।

মিলি মুখার্জিও সারা জীবন মরে থেকেছেন আর এখন মিলি মুখার্জি সর্বস্ব ছেড়ে চলে যাবার সময় বলে গেছেন, 'আর আসব না ভেব আমি মরে গেছি।'

এই মৃত্যুর কারণ কি মুখার্জি সাহেবের অসাবধানে হঠাৎ-হঠাৎ হাতে পড়ে যাওয়া এক-একটা মনি-অর্ডারের রসিদ? না-কি বিক্রম রায় নামের একটা প্রবল পুরুষ?

মিলি মুখার্জির কথা ভেবেফেলে বুকের মধ্যেটা এমন ঝিরঝিরে লাগছে কেন পলির? এই ঝিরঝিরে লাগাটাকে কি 'মন কেমন' বলে?

মিলি নামের মেয়েটা কেন ওই টুটু নামে মেয়েটার মতো জোরাল

হতে পারেনি? পলির দুঃখ হচ্ছে, পলির মায়া হচ্ছে, পলির রাগ হচ্ছে।

পলি, 'অ্যাডমিট কার্ড' এনেছিস?

পলি ফিরে তাকাল, সোমা।

অনেকদিন পরে।

আচ্ছা পলিও তো আর যায় না। কিন্তু সে কথার উল্লেখ করলো না সোমা। সোমা জানে 'রাজারনন্দিনী প্যারী' খেয়ালের বাতাসে ভাসে। গরীব গেরস্ত বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরির শখ মিটে গেছে রাজনন্দিনীর।

কিন্তু বন্ধুর অ্যাডমিট্ কার্ড সম্পর্কে চিন্তিত হয়েছে সোমা।

পলি তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, নাঃ।

আরে, আর তো সময় নেই—

না থাকুকগে। পরীক্ষা তো দিচ্ছি না।

পরীক্ষা দিচ্ছিস না!

সোমা স্তম্ভিত।

না! কি হবে দিয়ে?

আঃ! কী যে বলিসপলি! পাগলাম করিস না। চলে যাব। তোর আর যাওয়া কী বাবা, গাড়িতে চড়বি, হাওয়ার মতো পৌঁছে যাবি।

আগে-আগে কলেজ যাবার সময় সোমাকে ডেকে নিয়ে যেত পলি, কিন্তু সোমা প্রায়ই ছুতো করে এড়িয়ে যেত।

রুদ্রমূর্তি পলি একদিন বলে বসল, পরের গাড়ি চড়বি না তাই বল!

সোমা হেসে ফেলে উত্তর দিয়েছিল, সত্যিই ভাই। রোজ-রোজ চড়লেই অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, তখন বাসের ভীড় ঠেলতে আতঙ্ক হবে।

পলি চড়াগলার বলেছিল, ঠিক আছে—একেবারে বরের গাড়িতেই চড়িস। তাতে তো আর অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবার ভয় থাকবে না!

তদবধি আর গাড়ি অফার করেনি পলি।

কদাচ কোনোদিন সোমাই ইচ্ছে করে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে বলেছে, একটু লিফট্ দে।

গাড়ির ভাগ্য।

বলে পলি দরজা খুলিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

এতদিনের মধ্যে সোমার সঙ্গে যে কেন বিচ্ছেদ ঘটায়নি পলি এটাই রহস্য। অবশ্য সোমার সহনশীলতাও তার একটা কারণ।

আজ সোমা গাড়ির সুখের কথা তুলেই ভয় পেল এই বুঝি পলি রুদ্রমূর্তি ধরে কিছু বলে বসে। কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না পলি, শুধু বলল, নাঃ ঠিক করে ফেলেছি দেব না। আর পড়িও না।

সোমা ভাবতে পারে না।

সোমার স্তম্ভিত ভাব কাটতে চায় না। পলি যদি বলত, ঠিক করেছি সুইসাইড্ করব, সোমার বোধহয় সেটা এর চাইতে বেশি হত না।

তোর বাবা কিছু বলছেন না?

ক্ষীণ প্রশ্ন সোমার।

কী বলবেন? আমি যদি না দিই, বলবার কী আছে?

পলি, লক্ষ্মীটি রে, এমন করিস না।

পলি শিথিল গলায় বলে, আমার কিছু ভাল লাগে না। আমার কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

সোমার আর কথা বলার সাহস হয় না।

একটু বসে থেকে নিশ্বাস ফেলে চলে যায়।

কিন্তু চলে গিয়ে কী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে সোমা? এই খাম-খেয়ালী হঠাৎ-হঠাৎ কটুভাষিণী, অকারণ উগ্রচণ্ডা হয়ে-ওঠা রাজ-নন্দিনী বান্ধবীটিকে সোমা সত্যিই ভালবাসে। সোমার মনে হয়, এত থেকেও মেয়েটা যেন দুঃখী।

পলির মার উপরও রাগ আসে সোমার।

কেবলই বাবার অসুখ বলে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকা কী বাবা! আর আশ্চর্য! আঠারো-কুড়ি বছর ধরে একটা মানুষ পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছে, তার এদিক-ওদিক হয় না?

বাড়ি ফিরে 'আপসে' পড়ল সোমা, সোমা সেদিন যে বড় বলেছিলে ওই 'দুঃখী' রাজকন্যাটির জন্যে ভাবছ, কী হলো তার?

বলল এই ভাবে।

কারণ সেই তার জ্বরের সময় মনে-মনে যে অঙ্কটা কষে ফেলেছিল সোমা, দেখছে সেটার যোগফল মিলছে না।

কেন কী হলো?

হাতের বইটা মুখে রেখে বলল দেবনাথ।

পলি বলছে, পরীক্ষা দেবে না।

দেবনাথ বোনের ক্ষুব্ধ উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাতে তোর কী হচ্ছে?

আমার কী হচ্ছে? বোকা মেয়েটা, খেয়ালের বশে নিজের এতটা ক্ষতি করে বসবে, দেখেশুনে চুপ করে থাকব?

দেবনাথ আবারও হাসে, গরীব-গেরস্তদের ছেলেমেয়ের কাছে এটা যেমন ভয়াবহ ক্ষতি, বড়লোকের ছেলেমেয়ের তা নয় রে সোমা।

তা বলে শুধু শুধু পরীক্ষা দেবে না?

হয়ত শুধু-শুধু নয়।

জানি না, সোমা বলে, আমার এত খারাপ লাগছে। আবার বলছে, ওর নাকি কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে, মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

তাই নাকি!

দেবনাথ বলে, খোঁজ নিয়ে দেখিস—প্রেমে-ট্রেমে পড়েছে কিনা।

ঠাট্টা নয় দাদা। আবার ভাবনা হচ্ছে মানসিক ব্যাধি-ট্যাধি হচ্ছে না তো?

হলে হবে। বাবার তো পয়সার অভাব নেই, আর শহরে ডাক্তারেরও অভাব নেই।

দাদা তুমি আমায় রাগাচ্ছ। দোহাই দাদা, একটু চেষ্টা করে দেখ না।

আমি?

দেবনাথ চোখ কপালে তোলে, আমি কে? আমি কেন? কিসের দায়ে?

সোমা গম্ভীর হয়ে যায়, বলে; তুমি একটা মানুষ এবং তুমি শিক্ষাব্রতী।—আর তোমার 'কেন'র উত্তর হচ্ছে মানবিকতার দায়ে।

না। তুই আমায় না উঠিয়ে ছাড়লি না—

দেবনাথ উঠে পড়ে।

হাসতে-হাসতে বলে, সব সময় এত তালঠুকে সীরিয়াস হয়ে যাস্ ৺ঃ!

রঞ্জিতমোহন বসে ছিলেন চুপ করে।

রঞ্জিতমোহনের হাতে একখানা বইও নেই।

দেবনাথ এসে বিনা ভূমিকায় বলে উঠল, সোমা বলছে পলি না-কি পরীক্ষা দেবে না ঠিক করেছে? ঠাট্টা করেছে, না সত্যি?

হ্যাঁ, পলি!

পলিই বলল অবলীলায়।

রঞ্জিতমোহন কি এটা লক্ষ্য করলেন?

হয়ত করলেন, হয়ত করলেন না। আস্তে বললেন, ঠাট্টা নয়। বলছে তো তাই—

আপনি বকছেন না?

রঞ্জিতমোহন মৃদু হেসে বলেন, অভ্যাস নেই।

ওই তো মুশকিল। আমার কিন্তু স্টুডেন্টরা—না পড়লেই বকুনি লাগান অভ্যাস। পেশা তো? আমি কি একটু বকুনি লাগানোর ভার নিতে পারি?

রঞ্জিতমোহন একটু সোজা হয়ে বসেন, কেমন একরকম হেসে বলেন, ওর সব ভারই নাও না দেখনাথ। নিতে পার না?

দেবনাথ ডানলোপিলোর গদিতে বসে-থাকা এই দুঃখী ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, চেষ্টা করব।

আমার সঙ্গে একবার একজায়গায় চল তো—

এখানে বিনা ভূমিকা।

এবং আকস্মিক আবির্ভাব।

…এখানেও চুপ করে বসে নয়, দাঁড়িয়ে।

ভিতর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আজও ভাবছিল পলি, কই আগে তো বাড়িটা এত বড় লাগত না এত খালি-খালি। কোনোদিন তো মনে হতো না বাড়িটায় প্রয়োজনেব অতিরিক্ত ঘর আছে।

আব বাড়িটায় তো এমন স্তব্ধতাও থাকত না।

এ যেন শ্মশানের স্তব্ধতা।

যারা কাজকর্ম করে তারাও এখন কাজ কবে নিঃশব্দে, ঝগড়া করে না নিজেদের মধ্যে মিলি মুখার্জিব সেই সাবাক্ষণ বকাবকিটাও যেন প্রার্থিত মনে হচ্ছে এখন।

এই নিথব বাড়িটা থেকে কি পালিয়ে যাওয়া যায়? পালান সহজ গোলমালের মধ্যে থেকে।

শৃঙ্খলাহীন চিন্তা। অন্যমনস্ক চিন্তা।

এটা নতুন।

পলির চিন্তার ধারা চিরদিনই মজবুত। মনে-মনে কথা কইতে-কইতেই তো বয়সের অপেক্ষা বড় হয়ে বসে থেকেছে পলি। পলির এই অন্যমনস্কতাব মাঝখানে ধাক্কা পডল।

আমার সঙ্গে চল তো এক জায়গায়।

'চল।'…পলি চমকে যায়।

পলি কি ঠিকরে উঠবে, আমায় হঠাৎ 'তুমি' বলাব অধিকার কে দিল আপনাকে?

আশ্চর্য, পলির নামের সর্বদা ঠিকরে ওঠা মেয়েটা এখন এই লোকটার এই দুঃসাহসেও ঠিকরে উঠল না। শুধু তার মুখের চামড়ার নীচে থেকে ঠিকরে উঠল একটা আলো।

তার মানে? কোথায় যাব।

সেটা যেতে-যেতে শুন, এখন দেবি করার সময় নেই।

কী আশ্চর্য, কারণ জানি না, কোথায় যেতে হবে জানি না, 'চল মানে?'

ভয়ের কী আছে?…দেবনাথ ওর দিকে তাকিয়ে বলে, নিয়ে পালাব এমন সন্দেহ হচ্ছে না কি?

পলি অবাক হয়ে তার সামনের ওই উজ্জ্বল মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে।…লাল-লাল মোটা চালের ভাত খাচ্ছিল পলি কার মুখোমুখি বসে?

ভালবাসায় মরে যাবার জন্যে যার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চাইছিল পলি, অথচ কুয়াশার মধ্যে থেকে ধরতে পারছিল না, সেই মূর্তিটা কি কুয়াশা ভেদ করে স্পষ্ট অবয়ব নিয়ে দেখা দিচ্ছে?

পলি ওই মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির গলায় বলে, সাহস হয়?

সাহস! কিসের?

নিয়ে পালাবার।

দেবনাথ অপলকে চেয়ে বলে, এমন রোমাঞ্চকর কথা ভেবে দেখিনি কোনদিন।

আমি কিন্তু এতক্ষণে ওই কথাটাই ভাবছিলাম। যদি কার সঙ্গে কোথাও পালিয়ে যেতে পারতাম।

অফার দিচ্ছি। আপত্তি হচ্ছে?

খুব দুঃখ দুর্দশার মধ্যে কাটাতে পারবেন? ছোট্ট ভাঙা বাড়িতে থাকতে পারবেন? লাল-লাল মোটা চালের ভাত খেতে পারবেন?

জোর-জোর গলায় প্রশ্ন করে পলি!

দেবনাথ কপালে একটা হাত ঠেকিয়ে বলে, সেলাম মিসি বাবা। এ প্রশ্নটা কে কাকে করবে?

ঠাট্টা নয়, ওই আমার ইচ্ছে।

ঠিক আছে, এরকম একটা হতভাগার সঙ্গে পালালে, ও ইচ্ছে পূরণের অভাব হবে না।…তাহলে এখন নির্ভয়ে রথে উঠবে চল।

ওঃ আপনি ঠাট্টাই চালিয়ে যাচ্ছেন—

পলি হঠাৎ নিজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়, আমি সত্যি বাচ্চা নই।

দেবনাথ এগিয়ে আসে, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, ঠাট্টা নয় পলি, তোমাকে আমি বুঝতে পারছি। বুঝতে শিখছি।… তবু

সংসারে কিছু বাস্তব দিকও তো আছে। তার সঙ্গে তো খাপ খাওয়াতে হবে।...তলওয়ারকেও সব সময় খোলা রাখা চলে না দরকারের সময় ছাড়া খাপে পুরে রাখতে হয়।

মিলি

কলকাতার বাড়ি থেকে দু'টি-একটি করে সংগ্রহ করে ঘুমের বড়িগুলো সব নিয়ে এসেছিলাম, হিসেব মতো যথেষ্টই ছিল ; হয়ত অতিরিক্তই ছিল ; তবু স্থির নিশ্চিতের নিশ্চিন্ততা পেতে এখানে এসেও সংগ্রহ করে ফেলেছি কিছু, অথচ সেগুলো পড়ে রয়েছে কাজে লাগান হচ্ছে না।... প্রতি মুহূর্তেই তো মনে পড়ছে অনেক জামাকাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সেই ছোট্ট শিশিটার উপস্থিতি।... অথচ তাকে বার করে আনা হচ্ছে না, ছিপিটা খুলে ফেলা হচ্ছে না।

এ যেন জীবন আর মৃত্যুকে নিয়ে একটা লোফালুফি খেলা। দুটোই রয়েছে হাতের মুঠোয়, যে-কোন মুহূর্তে একটাকে ফেলে দিয়ে বাকিটাকে আঁকড়ে নিয়ে বসে পড়ে খেলায় বিরতি।

কাকে ফেলে দেব, কাকে আঁকড়ে ধরব, সেও তো ঠিক হয়েই আছে, চুক্তিপত্রে সই করে রেখে দিয়েছি, তবে আরো কিছুক্ষণ খেলে নিই না কেন ?...তা'তে তো কারো কিছু এসে যাচ্ছে না ?...কিন্তু হঠাৎ ভারী আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আজকাল ! পৃথিবীটাকে কি আগে কখনো দেখিনি ? এত সুন্দরী কবে ছিল পৃথিবী ? এত মোহময়ী ?...কতবারই তো ছয় ঋতুর খেলা দেখলাম, তবু কেন প্রথম বৈশাখের এই উত্তাল হাওয়া দেখে মনে হচ্ছে এমন কখনো দেখিনি।... কালবৈশাখীর প্রবল বর্ষণে সব পাতা ধুয়ে যাওয়া সবুজ গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে আগে তো এমন হতো না।...ভোরের সূয্যি-ওঠা পুব আকাশ, আর সন্ধ্যায় সূয্যি-ডোবা পশ্চিম আকাশে যে এত রঙের লীলা চলে আহা কখন তাকিয়ে দেখিনি, এটাই কি সত্যি ?

না-কি পৃথিবী হঠাৎ এত সুন্দরী হয়ে উঠেছে? যখন-তখন কত-কিছুতেই অবাক হয়ে যাচ্ছি আগে কখন দেখিনি বলে, হতাশ হয়ে যাচ্ছি আগে কেন দেখিনি বলে।

তবে দেখেই নিই না আর কটা দিন। সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করে নিই বাতাস কত মধুর, আকাশ কত নীল, আলো কত উজ্জ্বল।··· সারাজীবন এদের দিকে তাকিয়েও দেখিনি, উপেক্ষা করে চলেছি, এরা তাই এখন আমার দিকে উপহাসের হাসি হাসছে।···বলছে 'আমরা তোমারই ছিলাম, পৃথিবীটাই তোমার ছিল।'

মরতে বসে—মরণকালে আমি কি কবি হয়ে পড়ছি না কি? কিন্তু একে তো প্রশ্রয় দিলে চলবে না। সংকল্পে স্থির থাকতে হবে।··· একদিন রাত্রে ঘুমের আগে শিশিটা বার করতে হবে। একটু বাধা শুধু বাবা। বাবার অবস্থা চোখে দেখা যায় না, প্রতিক্ষণ মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে চলেছে, শুধু ঘণ্টাটা একবার থেমে যাওয়ার অপেক্ষা।··· তাঁর মিলির কি উচিত নয় নিজেও সেইটুকু অপেক্ষা করা!

না, এখন আর 'মিলি' বলে ডাকবার ক্ষমতা নেই, শুধু চোখ দিয়ে জল পড়লে বোঝা যায় কিছু বলতে চান।···জীবনের এই ভয়াবহতা দেখলে আতঙ্ক হয় তাড়াতাড়ি শিশিটাকে দেখে নিই, আছে তো। হারিয়ে যায়নি তো।···একটা অমোঘ আর 'প্রবল শক্তি' আমার হাতের মধ্যে, আমি যখন ইচ্ছে দাঁড়ি টেনে দিয়ে চলে যেতে পারি।···তবে সেই দিনটাকে ত্বরান্বিত না করলেই বা ক্ষতি কী? যে পৃথিবীতে সবাই রয়েছে, সেখানে আর কিছুদিন থাকছি আমি এই তো।···

বিক্রম বলে, এবারে তুমি দারুণ বদলে গেছ। অন্যবারে তোমার আসাটা একটা উৎসবের মতো লাগে, তোমার উপস্থিতিতে সবটা ভরে যায়, সবটা ভরে থাকে।···এবারে মনে হচ্ছে কোনখানে নেই তুমি।···

বিক্রম এবারে মাঝে-মাঝেই 'তুমি' করে কথা বলছে আমায়। কেন কে জানে! আমার অন্যমনস্কতা কি ওর কাছে আমায় দূরের মানুষ করে তুলছে?···কিন্তু কী করব বিক্রম, তোমায় তো বলতে

পারছি না, কী তোলপাড় আমার মধ্যে···বলে ফেলতে পারছি না, বিক্রম আমি একটা অমোঘ চুক্তিপত্রে সই করে বসে আছি, আমি একটা অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যে তুলছি।···

আরও একটা কথা মাঝে-মাঝেই বলছে বিক্রম। বলছে তোমায় একটা কথা বলবার আছে, না বলে আমার মুক্তি নেই।'

কী সেই কথা!···এ কী সেই কথা, যে কথা চিরদিন আমার মনের গভীরে সন্দেহের কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে,তারই স্বীকারোক্তি?···বিক্রম মেয়ে মনের তীক্ষ্ণ অনুভূতি অনেক অজানা রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে।···তুমি আমার জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত, অথচ একদা যখন আমিও উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে মরীয়া হয়ে তোমার কাছে এসে ধরা দিতে চেয়েছি, তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ, তুমি পালিয়ে গিয়েছ।···অপমানের যন্ত্রণার মধ্যে থেকে আমি এক ভয়ঙ্কর সত্যের চেহারা দেখতে পেয়েছি।···তবু তুমি আমায় ডাক দাও, তবু আমি ছুটে-ছুটে আসি।···কিন্তু আর পারছি না, নিজের ওপর ঘৃণা এসে গেছে।··· তবু জীবনে কত মায়া, আশ্চর্য।

মরবার জন্যে আমি এখানে চলে এলাম তো শুধু অর্থহীন মায়াটার জন্যেই। কলকাতার বাড়িতেই তো মৃত্যুটাকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলতে পেরেছিলাম। তবু মরতে পারিনি।···আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে বিক্রমকে, দেখতে ইচ্ছে হয়েছে আজন্মের স্মৃতি মাখান এই জায়গাটাকে দেখা দিতে ইচ্ছে হয়েছে বাবাকে, এমন কি বোকা বিজনটাকেও।···

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মরবার আগে যদি রঞ্জিতকে একবার দেখতে পেতাম।···দেখতে পেতাম আমার দুঃখ-যন্ত্রণা-জ্বালা, আমার সুখ-আহ্লাদ-আনন্দ পলিকে।

এখানে বাগানে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ-হঠাৎ যেন সেই ছোট্ট পলিকে দেখতে পাই। প্রজাপতির পিছনে ছুটছে, কুকুরছানাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এক একবার কৃতার্থমন্য হয়ে আমার কাছে এসে বসছে।···তখন ওকে সরিয়ে দিয়েছি, ওর প্রত্যাশার মুখের দিকে

তাকিয়ে দেখিনি।...এখানে আসতে—কী ভালই বাসত সেই ছোট্ট মেয়েটা, আর আনিনি।

ও অবাক হয়েছে, আহত হয়েছে, অভিমান করেছে, আমি শক্ত হয়েছি।

এখন যদি ডাকি—পলি, মরবার আগে তোকে একবার দেখবার জন্যে বড্ড ইচ্ছে করছে ও কি আর আসবে?...

নাঃ ডাকা যাবে না।

ওর সেই বিদ্রূপে কুঁচকে যাওয়া মুখটা আরও কুঁচকে যাবে, সেই মুখে অবজ্ঞার হাসি হেসে বলবে, ওঃ তাই নাকি? ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো।

কিন্তু সরি ম্যাডাম!

কিন্তু রঞ্জিত?

রঞ্জিত তা' করবে না। রঞ্জিত ছুটে আসবে। রঞ্জিত, মরবার আগে তোমায় একবার দেখব। না দেখে মরতে পারব না।... না, ক্ষমা টমা চেয়ে নাটক করব না, শুধু বলব, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছিল রঞ্জিত,—আর বলব, 'নয়নতারা'কে নিয়ে আমার সত্যি কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমি তোমায় বিশ্বাস করি। ওটা শুধু ঝগড়া বাধাবার জন্যে—

দেখার পর, বলার পর, গভীর রাত্রে লুকনো জায়গা থেকে বেরোবে সেই সযত্নে সঞ্চয় করা সেই শক্তিকণা।...যে শক্তির বলে 'মিলি মুখার্জি' নামের চির অতিশপ্ত একটা আত্মা হঠাৎ সকলের ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারবে।

খরায় ফাটা রুক্ষ মাটিতে নেমেছে প্রবল বর্ষণ, ভিজছে মাটি, ভিজছে শুকিয়ে-ওঠা শস্য, ফাটলে-ফাটলে আর্দ্রতা, ফাটলের নীচে শ্যামলিমার রোমাঞ্চ।...ক্রমে ঢল নামছে নদীতে সবুজের সমারোহের আভাস।

প্রকৃতি কৃপণা হলে ভয়ঙ্করী, অকৃপণ হলে প্রাণময়ী, লীলাময়ী। সেই অকৃপণ দানে পাত্রপাত্র বিচারের প্রশ্ন নেই।

অকৃপণা পলি লীলাময়ী পলি এখন হেসে-হেসে বলতে পারে, সুরেশদা তোর মনে আছে ছেলেবেলায় তোকে কিরকম মিছিমিছি দোষ দিয়ে বকুনি খাওয়াতাম…জান দেবনাথ, দুধ ফেলে দিয়ে গ্লাস ধুয়ে রেখে বলতাম, দুধ দেয়নি তো সুরেশ। ইস্ত্রি করা জামার ভাঁজটাজ সব লাট করে ফেলে বলতাম, করেনি তো ইস্ত্রি।…আর হীরালালের কাছে পাখি বানাবার জন্যে ময়দা চাইলে না দিলে ওর মাথায় আটা ঢেলে দিতাম, গায়ে জল ঢেলে দিতাম।…এখন ভাবলে না—যা হয়ে লাগে।…অবশ্য তোরা তো আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতিস না। কি রে সুরেশদা করতিস?

একদা সুদূর অতীতে রঞ্জিতমোহন শিশু-কন্যাকে শিখিয়েছিলেন লোকজনকে 'দাদা' দিয়ে ডাকতে। অনেকদিনের অব্যবহৃত সেই ডাকটা যেন মরচে-পড়া কোনো ভাঙা বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়েছে আর কৌতুকছলে লোফালুফি হচ্ছে।

…ভালবাসা বুঝি সব পারে।

ভাঙতে গড়তে, রং বদলাতে।

অথবা যে হৃদয় ভালবাসার জন্যে মরে যেতে চাইছিল, তার উপরই ভালবাসার এতো আধিপত্য।

নিজেকে ভেঙে-ভেঙে নষ্ট করে অনেকদিন তো দেখলে পলি একবার জুড়ে-জুড়ে গড়ে তুলে দেখ তো ভাল লাগে কি-না।…

বলেছিল দেবনাথ, দেখ পৃথিবীর সবকিছু ভাল লাগবে, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করবে।

পলি তাই নিজের ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে তুলে-তুলে জুড়ে-জুড়ে দেখছে গড়া যায় কিনা।

রঞ্জিতমোহন কি একা এই দৃশ্য উপভোগ করবেন? তাতে কি সুখ আছে?

রঞ্জিতমোহন সেই কথাটুকু জানাবার জন্যে আস্ত একটা প্যাড খরচা করে ফেলছেন পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে।…দু-লাইন লিখতে—কত লাইন লেখা হচ্ছে তার হিসেব রাখছে কে?…

'মিলি, এবার তো তোমার না এলে চলে না, পলির বিয়ে—

ইস্। কী বিশ্রী ছি-ছি। এ কী একটা ভাষা। পলির বিয়ে। মিলির অজ্ঞাতসারে?

'মিলি, তোমার বাবা কেমন আছেন? এবার তো আসতে হয়, সব দিকে বিশৃঙ্খলা—'

দূর। অচল।

'মিলি, আর কতদিন থাকবে? এবার তো পলির বিষয় ভাবতে হবে। তুমি ছাড়া কে ভাবতে পারবে?…

নাঃ। এও ঠিক হচ্ছে না।

'মিলি চলে এস, বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখতে পাবে। পলি—

শুরুটা বেশ ঠিক হচ্ছে কি!

'মিলি, সংসারে একটা নতুন ঘটনা ঘটতে চলেছে, 'তুমি না এলে—'

ধ্যেৎ বাজে! বাজে! একদম বাজে।

ভাষার উপর কোনো দখল নেই আমার।

রঞ্জিতমোহন কলম সরিয়ে রেখে ভাবেন, পলিকে ডাকা যায় কি-না!

কিন্তু এখানেও তো সেই ভাষার উপর দখল বে-দখলের প্রশ্ন।… 'পলি তোর মাকে আসবার জন্যে একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করছি, সুবিধে হলো না, তুই লিখে দিবি?'

অসম্ভব, এভাষা চলতেই পারে না।

'পলি, তোর মিলি মুখার্জিকে তো এবার আসতে বলা দরকার? পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তো—'

হচ্ছে না, হচ্ছে না।

মিলি মুখার্জিকে চলে আসতে বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না রঞ্জিত মুখার্জি।…অথচ মিলি মুখার্জিকে বাদ দিয়ে এত সুখ ভোগ করবেন কী করে? মিলি মুখার্জি যে বলে গেছে—'আর আসব না' সেটাকে অভিমানের কথা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, রঞ্জিত মুখার্জির সুখের উপর যে যাচ্ছেতাই করে গেছে, সেটার মধ্যে নিজের দোষ

খুঁজে পাচ্ছেন, আর মিলি ড্রিঙ্ক করে, মাঝরাত্তিরে চেঁচামেচি করে সেটা ভুলে যাচ্ছেন।

শুধু ভয়ানক অস্থিরতা আসছে—পলি হাসছে, পলি গল্প করছে, পলি গলা ছেড়ে গান গাইছে, পলি তার ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আর পলি, 'বাপী' বলে কাছে এসে বসে পড়ছে এই দৃশ্যটা মিলি দেখতে পাচ্ছে না বলে।

তবু ভাষাটা আসছে না কোনোটাই ঠিকমতো লাগসই হচ্ছে না। মনের মধ্যে যে প্রবল ঢেউ কল্লোল তুলছে, ভাষা তাকে ধরতে পারছে না। যা লিখতে যাচ্ছেন, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর লাগছে।

দু-লাইনের একটা চিঠি লেখা এত কঠিনও হয়ে উঠতে পারে?

কিন্তু সেই কঠিন কাজটা করে ফেলল মিলি মুখার্জি।…চিঠি যাবার আগে চিঠি এল।

'একবারটি দেখতে ইচ্ছে করছে, খুব ইচ্ছে করছে। একবারের জন্যে আসা যায় না?…সামনের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করব না আসতে পারলে বুঝব এজন্মের মতো ইচ্ছেটা তোলা থাকল। পলির কথা বলতে সাহস নেই।—মিলি।'

দু-লাইনের একটা চিঠি লেখাও যত শক্ত হচ্ছিল। তিন লাইনের এই চিঠিটা পড়া তার থেকে আরো বেশি শক্ত হচ্ছে। বার-বার চোখ বুলিয়েও অর্থ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

'রবিবার' কাকে বলে?

আজ কী বার?

জলপাইগুড়ি কি শুধুই রেলগাড়ি চেপে ঘষটে ঘষটে যেতে হয়? উড়ে যাওয়া যায় না? মেঘ ভেদ করে বাতাসটা এত কম আজ? রঞ্জিতমোহনের চশমার পাওয়ারটা কি বাড়ান দরকার?

অনেকক্ষণ পরে ওরা এল হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে।… পরীক্ষা শেষ হল আজ।…মাস্টারী করায় অভ্যস্ত দেবনাথ পড়িয়ে-পড়িয়ে মেরেছে পলকে। 'পড়া তৈরি হয়নি', এ কথাটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলে দেবনাথ, বাবাকে প্রণাম কর।

বাপিকে? ধ্যেৎ! প্রণাম কি?

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় প্রণাম কর না?

ভাগ! প্রণাম করব কি আবার বোকার মতো!

জীবনে বোকার মতো কাজ তো কম করনি। করবেও সারা-জীবন আর একটা না হয় যোগ হলো।

ইস! লজ্জা করে না বুঝি!

লজ্জা করে! গুরুজনকে প্রণাম করতে লজ্জা করে তোমার? আশ্চর্য তো! থাক এমনিই বলবে চল—

আচ্ছ বাবা আচ্ছা করছি পেন্নাম—

বলে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় পলি।

শিথিল ভঙ্গিতে বসে-থাকা রঞ্জিতমোহন হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, চিঠিটা পড়ে দেখ্ তো পাল মানে বুঝতে পারিস কি-না—

মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

কিন্তু রাবরার পর্যন্ত সময়ও তো রয়েছে। আকাশে উড়ে-উড়ে চলে যাওয়া যায় বৈ-কি।

বিক্রম রায় অবাক হয়ে বলল, কখন খবর পেলেন?

বিক্রমের চুল রুক্ষু মুখ কালি মাখা, পা খালি। বিক্রমের চেহারার মধ্যেই একটা মৃত্যুর বারতা। রঞ্জিতমোহন চেঁচিয়ে উঠলেন 'কোন খবর?'

বিক্রম আরো অবাক হলো, এত উতলা হবার কী আছে? আমি শুধু ভাবছি টেলিগ্রামটা পৌঁছল কখন?... প্লেনে এলেও—

রঞ্জিতমোহন দেবনাথের কাঁধটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চেরা-ফাটা কেমন-একরকম গলায় বলেন, পলি জিগ্যেস কর কোন্ খবর। কিসের টেলিগ্রাম?

বিক্রম শুকনো গলায় বলে বুঝতে পেরেছি আসাটা দৈবাতের ঘটনা। উনি মারা গেছেন! কাল সন্ধ্যাবেলা—

দেবনাথ শক্তহাতে রঞ্জিতমোহনকে ধরে রেখে স্থিরগলায় প্রশ্ন করে, কী হয়েছিল ওঁর ?

বিক্রম আরো স্থির, আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না এঁদের সঙ্গে বোধহয় নতুন পরিচয়। উনি তো আজ বিশ বছর ধরে বেড্-রিডিন হয়ে পড়েছিলেন।···আসুন ভিতরে। ডেড্‌বডি বার করা হয়নি এখনো—মিলি ওখানেই আছে।

মিলি ওখানে আছে···মিলি ওখানেই···

রঞ্জিতমোহন কি বিক্রম রায়কে বুকে জড়িয়ে ধরবেন ? না তার পা পুজো করবেন ?

মেয়ের বিয়ে দিলে কবে ?

কোনো এক সময় বলল মিলি, কোনো একটা আড়ালে।··· রঞ্জিতমোহন তাকিয়ে দেখলেন।

কী রয়েছে ওই মুখে ?

ব্যঙ্গ ? বিদ্রূপ ? ঔদাস্য ? না-কি কিছুই নয় ?

বললেন, তোমার অনুপস্থিতিতেই বিয়ে হবে ?

মিলি হাসল, আমি তো মৃত।

তুমি আবার মৃতের খাতায় নাম লেখালে কখন ?

রঞ্জিতমোহন গভীর গলায় বললেন, লেখালেই কি সে লেখা পাকা খাতায় ওঠে ?

আমার তো সব খাতাই কাঁচা।

মিলি আস্তে বলে, সারাজীবন কলম নিয়ে শুধু হিজিবিজিই কেটেছি।

আমরা সবাই তাই করি মিলি, সবাই তাই করেছি। তবু বাঁচতেও চাই।

মিলি, একটু হাসে। সদ্য পিতৃবিয়োগের-শুকনো মুখে হাসিটা খুব করুণ লাগে। সেই করুণ-করুণ হাসিমুখেই বলে, মিলি মুখার্জির আর হবে না।

হবে না বললে ছাড়ছে কে ? আমার সাধ্য একা মেয়ের বিয়ের ভার সামলাই ?···

ওরা কোথায় ?

পলি ওকে বাগান দেখাচ্ছে।

ছেলেটিকে কোথায় পেলে ?

বাড়ির দরজাতেই ছিল। পলির বন্ধু সোমার দাদা।

মিলি একটু অবাক হয়, সোমার দাদা। কই দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

কিন্তু কবেই বা কার দিকে তাকিয়ে দেখেছে মিলি ? নিজের দিকে ছাড়া।

এখন হয়ত সেটাও ছেড়ে দিয়েছে, অথবা গতকালকের ওই মৃত্যুর ঘটনা মিলিকে এমন বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। প্রত্যাশিত মৃত্যু, আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু, মৃত্যুর ছদ্মবেশে মুক্তিদূত, তবু মৃত্যু মৃত্যুই।··· তার ভার আছে দায় আছে। বেদনাবোধও আছে। তবুও আক্ষেপ আসবেই হয়ত উচিতমতো যত্ন নেওয়া হয়নি, বিষণ্ণতাবোধ আসবে হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রেখে ব্যবহার করা হয়নি, আর সমস্ত পৃথিবী যার কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার কাছে 'এক কণা পৃথিবী !' উপহার নিয়ে যাবার উদারতা হয়নি।···এত দীর্ঘস্থায়ী অনড় রোগীর জন্য এ-বেদনা এ-আক্ষেপ আসবেই। হারিয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত যা পাষাণভার, হারিয়ে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই তো তা বাতাসের মতো হালকা হয়ে যায়, তখন বড় বেশি চোখ পড়ে যায় আপন হৃদয়ের কার্পণ্যের দিকে।

তাই মিলিকে এত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

শবযাত্রীরা এখন সবাই এসে জড় হয়নি, যারা এসেছে বাইরে গুলতানি করছে, বিক্রম রায় মাঝে-মাঝে বাইরে, মাঝে-মাঝে ভিতরে। মৃতের ঘর থেকে মাঝে-মাঝেই বাতাসে ভেসে আসছে কড়া ধূপ অগুরু আর ইউক্যালিপটাসের গন্ধ।···বৈশাখের দুপুরের কড়া রোদও গন্ধটাকে একেবারে শুষে নিতে পারছে না। রঞ্জিতমোহনের চেতনার গভীরে কোথাও যেন সঞ্চিত আছে এই বিচিত্র মিশ্রিত সৌরভের স্পর্শ, রঞ্জিতমোহন কি তাই এখন মিলি মুখার্জির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন ?

তাই গভীর গলায় আস্তে বললেন, মিলি জীবনে অনেক ভুল করেছি, করেই চলেছি, তবু একটা মস্ত ভুল করা হয়ে গেছে 'নয়নতারা' কে এ-কথা তোমায় না জানান। অকারণ দুঃখ পেয়েছ তুমি!

মিলি মনে-মনে বলে, এই কথাটাই তো তোমায় বলতে চাইছিলাম, তুমিই বললে, বড় ভাল হলো।···মিলি তারপর মুখে বলল দুঃখ তো পাইনি। আমি তো জানি 'নয়নতারা' আমার কোনো সমস্যা নয়, জানি তোমাকে দিয়ে কোনো ছোট কাজ হবে না, শুধু ঝগড়া বাধাবার জন্যে আমি 'নয়নতারা'কে প্রাধান্য দিয়েছি।

মিলি এখন তো—

মা! ওকে আমার ছেলেবেলার খেলার জায়গাগুলো দেখিয়ে আনলাম।

পলি এসে দাঁড়িয়েছে, তার পিছনে দেবনাথ।

এই রোদে বাগান বেড়িয়ে আসায় ওদের মুখচোখ লাল, সর্বাঙ্গে ঘাম। তবু পলির দিকে তাকিয়ে বুক জুড়িয়ে যায় মিলির, মিলির এক্ষুণি, এই পরম মুহূর্তটিতে মরে যেতে ইচ্ছে হয়।···মিলির আবার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়।

পলি, মৃত্যুকে ঘরের দরজায় ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, এখন তুই আমায় প্রলোভন দেখাতে এলি জীবনের পাত্র হাতে নিয়ে।···

কিন্তু মনে-মনে বলা কথা কে শুনতে পায়?

মিলিকে তাই মুখে বলতে হয়, রোদে ঘুরছো, এসে অবধি তো একটু জলও খাওয়া হয়নি।

রঞ্জিতমোহন তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, কী আর করা, যেমন দিনে এসে পড়া হলো। পরে হবে।

মিলি অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু এরা কি থাকবে? এরা তো চলে যাবে।

আমরা তো চলে যাব না।

দেবনাথ গম্ভীরভাবে বলে, আমরা আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি না গেলে তো কিছুই হবে না।

নিভৃতে লুকন সেই ছোট্ট শিশিটা যেন উঁকি মেরে ব্যঙ্গ হাসি হাসে।...মিলি মনে-মনে বলে, না, আমাকে আর তোমরা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। যে নিয়ে যাবার সে দরজায় অপেক্ষা করছে।

শবযাত্রীরা সকলে এসে পড়েছে। নিথর হয়ে থাকা পরিস্থিতিতে এখন নতুন চাঞ্চল্য।...মিলিকে কে বলবে? মিলিরই তো যাওয়া উচিত সঙ্গে, একমাত্র সন্তান—শেষকৃত্য করার দায়িত্ব তো ওরই।

কী আশ্চর্য! এতক্ষণ কেউ একথা তোলেনি। তুললে তো মিলিকে প্রস্তুত হবার সময় দেওয়া হতো।

রঞ্জিতমোহন ব্যাকুলভাবে বলে ওঠেন মিলিকে কি যেতেই হবে বিক্রমবাবু?

বিক্রম রায় মিলির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে বলে, দরকার নেই, আমি গেলেই চলবে।

কৃতজ্ঞ রঞ্জিতমোহন বলেন, তা যদি হয় বড় ভাল হয় বিক্রমবাবু। মিলির পক্ষে—

মিলি কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার মান রাখে না, মিলি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মিলি মুখার্জির পক্ষে কোনো কিছুই শক্ত নয় রঞ্জিত, আমিই যাব।

পারবে না মিলি, খুব কষ্ট হবে।...বড় নিষ্ঠুর এই প্রথা।

মিলি উপস্থিত জনদের দিকে তাকায়, সকলের মুখে চোখ ফেলে একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, প্রথা আর কতটুকু নিষ্ঠুর হতে পারে? সময়ে-অসময়ে কখনো একবার।...তার বেশি তো নয়? চলে যাচ্ছি। ...বাবার জন্যে বিক্রম তো জীবনটা বিকিয়ে ফেলল, সে-কথা তুলতে যাব না, তবে বাবার শেষ কাজটা আমাকেই করতে দাও।

মিলি!

মিলিকে ডাকলেও সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বিক্রম।...রঞ্জিতমোহনের অসহায়-অসহায় মুখের দিকে পলির বিহ্বল

মুখের দিকে, দেবনাথের বিস্মিত মুখের দিকে, আর মিলি মুখার্জির দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মুখের দিকে।

তাকিয়ে দেখে বিক্রমও কেন একটা পাথুরে হাসি হেসে অমোঘ স্বরে উচ্চারণ করে—'তোমার' বাবার জন্যে জীবন বিকিয়ে বসিনি। আমি মিলি যা করেছি আমার বাবার জন্যেই। যিনি চলে গেলেন, তিনি শুধু তোমারই বাবা ছিলেন না।···কথা শেষ করে না, তবু সেই অসমাপ্ত কথাটাই 'বিক্রম' নামের ওই হতভাগ্য লোকটার সারা জীবনের বঞ্চনার আর যন্ত্রনার ইতিহাস উদ্‌যাপিত করে দেয়।···অবৈধ।

অবৈধ! তার মানে জন্মের মূলেই গলদ।

জায়গাটায় যেন বাজ পড়েছে···না-কি একসঙ্গে সবাই সাপের কামড় খেয়েছে।

অবৈধ!···কী মর্মান্তিক, কী যন্ত্রনাদায়ক। পলি জানে ওই যন্ত্রনার স্বাদ।···অকারণ কত কত দিন সেই বিষাক্ত যন্ত্রনায় ছটফটিয়েছে পলি, পাগল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।···সেই জ্বলন্ত জ্বালা ওর।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সবাই সেই লোকটার দিকে, যে লোকটা সম্ভ্রমহীন স্বীকৃতিহীন রঙহীন স্বাদহীন ভবিষ্যতের আশাহীন এই বঞ্চনাময় জীবনটাকে টানতে-টানতে বাল্য-কৈশোর-যৌবন পার করে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে পৌঁছেচে—শুধুমাত্র আর-এক অবৈধ ভালবাসার নিষ্ফল নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে।·ওর ওই অমোঘ ঘোষনার মধ্যেই তো ব্যক্ত হয়ে আছে সেই নিষ্ফলতার খবর!

এই লোকটাকে আশৈশব দু-চক্ষের বিষ দেখেছে পলি, কিন্তু এখন আর রাগ আসছে না ওর উপর।···'ভালবাসার স্বাদে' উদার হয়ে গেছে পলি, ভালবাসার মূল্য বুঝতে শিখেছে। তাই ভালবাসার দায়ে জীবন বিকিয়ে দেওয়া লোকটার উপর ওর করুণা আসছে।

কিন্তু 'করুণা'র সুর তো প্রকাশ করা চলে না, তাই পলি খুব সহজসুরে অবলীলায় বলে ওঠে, তা তোমরা তো দুজনেই যেতে পার মা? দু-জনেরই যখন সমান দায়। মাকেও নিয়ে যান বিক্রমমামা।

শেষ